মহাসাগরে ছোট ভেলায় ৭৬ দিন

শেখর বসু

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টিভেন কালাহান

মহাসাগরে ছোট্ট ভেলায় ৭৬ দিন

ভাষান্তর

শেখর বসু

BanglaBook.org
The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

MAHASAGARE CHOTTO BHELAI CHIYATTAR DIN
By
Steven Callahan
Translated by
Sekhar Basu

First Punascha Edition
Book Fair 2004

Price : Rs. 40/- Only

ISBN No : 81-7332-441-5

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
বইমেলা, ২০০৪

প্রচ্ছদ : সরোজ সরকার
অলংকরণ : স্টিভেন কালাহান

দাম ঃ ৪০ টাকা

পুনশ্চ ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড কলকাতা-৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কষ্ট, লড়াই ও নিঃস্বতা কী যারা জেনেছে,
কিংবা জানবে—তাদের জন্যে—

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা

আজকের পৃথিবীর সবচাইতে গা-ছমছমে সমুদ্রযাত্রার বিবরণটি পাওয়ার কথা ছিল একটি বিধ্বস্ত ভেলার ভেতরে রাখা লগ্-বুকে। ভেলার মানুষটি ধরেই নিয়েছিলেন, তিনি আর বাঁচবেন না, বাঁচা সম্ভব নয়। অকূল অতলান্তিকে ক্রমাগত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হতে হঠাৎই তাঁর মনে হয়েছিল, ভয়ংকর এই অভিজ্ঞতার কথা লিখে যাওয়া দরকার। এটি হয়তো ভবিষ্যতে অন্য কোনও অভিযাত্রীর কাজে লেগে যাবে।

কিন্তু কী লিখবেন? চারদিকেই শুধু মৃত্যুর হাতছানি। বরং নিজের এপিটাফ আগেই লিখে রাখা যাক। মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষটির সেদিন আবার জন্মদিন। এপিটাফ লিখলেন তিনি।

সৌভাগ্যের কথা, এপিটাফ সত্যি হয়ে ওঠেনি। ভেলা বিধ্বস্ত হলেও ডুবে যায়নি মানুষটি। ঝড়ের সমুদ্র, হাঙর আর খিদেতেষ্টার সঙ্গে অমানুষিক এক লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি একটানা ছিয়াত্তর দিন ধরে। আজকের সমুদ্রের ইতিহাসে একটিমাত্র মানুষের এত বড়ো এক লড়াই চালাবার ঘটনা বুঝি আর একটিও নেই।

সুদীর্ঘ আড়াই মাসেরও ওপর ছোট্ট এক রবারের ভেলায় আঠারোশো নটিকাল মাইল ভেসে বেড়াবার পরে ডাঙার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন কালাহান। প্রায় অলৌকিক এই অভিযানের বিবরণ বার হয়েছে সম্প্রতি, এবং এটি গোটা পৃথিবীতে প্রচণ্ড এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একটানা ছিয়াত্তর দিন জীবন-মৃত্যুর মধ্যিখানের সরু সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভাবতে পারে কেউ?

কালাহান কিন্তু অতিমানুষ নন। দুঃখ-কষ্ট হতাশায় আক্রান্ত হয়েছেন বারবার, তবে ভেঙে পড়েননি কখনও। কান্নাকাটি করা চলবে না কিছুতেই। কান্না মানেই মৃত্যুর দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে যাওয়া। কালাহান লিখেছেন, "কাঁদতে গিয়ে ধমকেছি নিজেকে। ন্না, কাঁদা চলবে না। যে ভাবেই হোক সামলে নাও নিজেকে। কেঁদে জল নষ্ট করার বিলাসিতা এখন সাজে না। আমি ঠোঁট কামড়ালাম, চোখ বুজলাম, তারপর মনে-মনে কেঁদে নিলাম কিছুটা।"

এটি কোনও দার্শনিকের কথা নয়। এখানে না-কাঁদার অর্থই হল শরীরের মজুত জল বাঁচানো। ভেলায় খাওয়ার জলের সংগ্রহ ছিল যৎসামান্য। মাঝেমধ্যে এক-আধ ঢোক খাওয়া যেতে পারে শুধু। কিন্তু এভাবে জল বাঁচিয়ে কতক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব! শরীর জল চায়, প্রয়োজনীয় সেই জলের জোগান না দিলে ডিহাইড্রেশন।

ডিহাইড্রেশন আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে কান্নাকাটি করলে। কালাহানের মনে হয়েছিল, ওই অবস্থায় কাঁদা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাঁদলে শরীরের মজুত জল কমে যাবে কয়েক ফোঁটা। সুতরাং কাঁদতে হলে মনে-মনে কাঁদো। চোখের জল একটা ফোঁটাও নষ্ট করা যাবে না।

www.BanglaBook.org

শুধু তেষ্টার জলই নয়, খাবারের অভাবও এই মানুষটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল তিল-তিল করে। কালাহান লিখেছেন, "খিদে এখন আমার চর্বি খাচ্ছে, তারপর খাবে আমার পেশিগুলো, তারপরে খাবে আমার মনকে।"

ভেলায় খাবারের পুঁজি ছিল যৎসামান্য। কৃপণের মতো একটু-একটু করে খেলেও সেই পুঁজি ফুরিয়ে গেল একদিন। এবার?

খিদে-তেষ্টায় মৃত্যুর ঠিক মুখে এসে দাঁড়ানো এই মানুষটি বিস্তর চেষ্টায় একটা ট্রিগারফিশ ধরেছিলেন। কিন্তু মাছটার ছাল ছিল ঠিক গণ্ডারের চামড়ার মতো। গায়ের জোরে ছুরি চালিয়েও ওই ছাল ভেদ করা যাচ্ছিল না। তবে যে করেই হোক কাটতে হবে। ওই মুহূর্তে মাছটাই ছিল একমাত্র খাদ্য। অনেক চেষ্টার পরে ছুরি ঢুকল মাছের গায়ে, তারপর নিদারুণ খিদে-তেষ্টায় অবসন্ন মানুষটি যা করার ঠিক তাই করে বসলেন। "খয়েরি-লাল রক্ত চুষে নেওয়ার জন্যে আমি সদ্য-কাটা মাছের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলাম। যাচ্ছেতাই রকমের তেতো রক্ত, ফেলে দিলাম থু-থু করে। তারপর সামান্য ইতস্তত করে মাছের একটা চোখ খুবলে নিয়ে চিবোতে লাগলাম আমি।"

ছোট্ট ভেলাটি ভয়ংকর ঝড়ের মুখে পড়েছে কয়েকবার। কালাহান জানিয়েছেন, সমুদ্রে ঝড় যে কী সাঙ্ঘাতিক, ডাঙার মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এক-একটা ঢেউ প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু। সেই ঢেউ একটার পর একটা আছড়ে পড়ছিল ভেলার ওপর। ঢেউ আবার কেমন যেন ছোঁ মেরে ভেলাটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে দিচ্ছিল অনেক নীচের জলে। ভয়ংকর ওই আঘাতে ছোট্ট ভেলাটার টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। একে কপালজোর ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে!

BanglaBook.org

সমুদ্রের হিংস্রতম প্রাণী হাঙরের মুখেও পড়েছে এই ভেলাটি বারদশেক। হাঙরকে বলা হয় 'সমুদ্রের বুলেট!' ওই বুলেটের আঘাত কী করে সহ্য করেছিল তুচ্ছ এক রবারের ভেলা!

মাছ মারার ছোট্ট একটা বর্শা ছিল কালাহানের কাছে। তাই দিয়ে একটা হাঙরের গায়ে কয়েকটা খোঁচা মেরেছিলেন তিনি। কিন্তু মারা না-মারা দুই সমান। কালাহানের ভাষায় "এ যেন দাঁত খোঁচাবার কাঠি দিয়ে পাহাড় নাড়াবার চেষ্টা করা।"

ভেলা অবশ্য শেষ পর্যন্ত দুর্ভেদ্য থাকেনি। তলার দিকের একটা টিউব ফেঁসে যাওয়ায় আধখানা ডুবে গিয়েছিল জলে। ভেলার ওপরের মানুষটি তখন রুগ্ণ, শীর্ণ। পা-দুটো শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে। সারা শরীরে ঘা। তবু শুরু হল জলের মধ্যে ডুবে থেকে ভেলা সারাবার আর এক মরণপণ লড়াই।

কালাহান জানিয়েছেন, তাঁর জীবনের প্রথম উনত্রিশটি বছর এমন এক খাতে বয়েছে, যার সঙ্গে ভয়ংকর এই অভিযানের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু উৎস সন্ধান করতে গেলে তাঁর পেছনের জীবনের কথা এসে যাবেই। সেটা ছিল ১৯৬৪ সাল,

www.BanglaBook.org

কালাহানের বয়েস তখন মাত্র বারো, ওই বয়েস থেকেই সমুদ্রে ভেসে পড়তে শুরু করেছিলেন তিনি।

আসলে সমুদ্র তাঁকে গোড়া থেকেই টানত। দুর্নিবার টান। ওই টান এড়ানো সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সমুদ্রযাত্রার যে কোনও কাহিনি পেলেই গোগ্রাসে পড়তেন।

কিছুকাল বাদে পড়লেন রবার্ট ম্যান্‌রির 'টিংকারবেল'। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে ম্যান্‌রি তাঁর সাড়ে-তেরো ফুট বোটে চেপে ভেসে পড়েছিলেন সমুদ্রে। উদ্দেশ্য ছিল অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া। যাত্রা সফল হয়েছিল তাঁর। ছোট্ট এক নৌকোয় অতলান্তিক পার হতে ম্যান্‌রির সময় লেগেছিল আটাত্তর দিন। তখন পর্যন্ত ওটাই ছিল রেকর্ড।

কিছু-কিছু ঘটনা আছে যেগুলি স্বপ্ন দেখায় মানুষকে। ছোট্ট একটি নৌকোয় চেপে অতলান্তিকের ওপারে যাওয়া তেমন একটি ঘটনা। সেই ঘটনার বিবরণ পড়ার পরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন কালাহান— ছোট্ট একটি নৌকোয় চেপে তিনিও একদিন পাড়ি দেবেন অকূল অতলান্তিক।

নৌকো তৈরির পেশাতেই চলে এসেছিলেন কালাহান। ধরতে গেলে দিনরাত তাঁর সমুদ্রের ওপরেই কেটে যেত। কর্মব্যস্ত জীবন, কিন্তু ম্যান্‌রি আর টিংকারবেলের কথা তাঁর মন থেকে একবারের জন্যেও মুছে যায়নি। বরং বলা যেতে পারে, যত দিন যাচ্ছিল স্বপ্নে দেখা সেই ছবিটির রং তত গাঢ় হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

১৯৮০ সালে কালাহান তাঁর সর্বস্ব বেচে দিয়ে যে টাকা পান, তাই দিয়ে বানাতে শুরু করেন তাঁর স্বপ্নের নৌকো। ডিজাইন অন্য ধরনের, আর রীতিমতো শক্তপোক্ত নৌকো। লম্বায় একুশ ফুটের চাইতে একটু বেশি। কালাহান এই নৌকোয় চেপেই অতলান্তিক পাড়ি দিতে চান। অনেক ভেবেচিন্তে নৌকোর নাম দিলেন 'নাপোলেয়ঁ সোলো'।

সোলো তাঁর কাছে নিছক একটি নৌকো নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু। বলেছেন, নৌকোর প্রতিটি পেরেক আর কাঠের টুকরোকে আমি আলাদা করে চিনি।

১৯৮১ সালে ম্যান্‌রির পথে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন কালাহান। তবে এই যাত্রাকে তিনি কখনওই কোনও প্রতিযোগিতার মধ্যে বেঁধে রাখতে রাজি হননি। এ ছিল তার কাছে তীর্থযাত্রার মতো।

তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হল চমৎকার ভাবে। ওই নৌকোয় চেপে অতলান্তিক পাড়ি দিলেন কালাহান। স্বপ্ন সফল। এবার বোধ হয় নতুন স্বপ্ন দেখতে হবে। কিন্তু নতুন স্বপ্ন দেখার মুখেই শুরু হল ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন।

সোলোয় চেপে অতলান্তিক পার হওয়ার সময় এক বন্ধু ছিলেন কালাহানের সঙ্গী। সফর শেষ হওয়ার পরে বিদায় নিয়েছিলেন বন্ধু, কিন্তু কালাহান আর থামতে পারেননি। স্বপ্নের নিয়ম বড়ো অদ্ভুত। এক স্বপ্ন সত্যি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আর-এক স্বপ্ন শুরু হয়ে যায়। সোলো নিয়ে তাই ডাবল ক্রসিংয়ের জন্যে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলেন কালাহান।

www.BanglaBook.org

একা। একেবারেই একা। কিন্তু নিজেকে নিঃসঙ্গ বলতে রাজি হননি তিনি। একা হবেন কেন, সঙ্গী তো তাঁর হাতে-গড়া নৌকোটি। সোলো নিছক লোহা-কাঠ নয় তাঁর কাছে। সোলোর প্রাণ আছে, সব সময়ই সেই প্রাণের উত্তাপ পান তিনি।

দশ হাজার মাইলেরও বেশি সমুদ্রে ভেসেছে সোলো। একবার অতলান্তিক পার হওয়ার পরে দ্বিতীয় পাড়ির অর্ধেক পথ চলে এসেছিল নৌকো। কালাহানের নিজভূমি মার্কিন মুলুক তখনও অনেক দূরে। সোলো এগিয়ে চলেছিল ক্যারিবিয়ানের দিকে।

সমুদ্রপ্রেমিক কালাহান সমুদ্রকে একটু অন্যভাবে দেখেন। তাঁর চোখে সমুদ্র কেমন যেন উদাসীন প্রকৃতির। এই উদাসীনতা আছে বলেই বোধহয় সমুদ্র এত রহস্যময়। সমুদ্রের বুকে ভাসতে-ভাসতে বিচিত্র এক উপলব্ধি তৈরি হয়েছে কালাহানের। বলেছেন, সমুদ্রযাত্রায় গেলেই তিনি নতুন করে তাঁর তুচ্ছতার কথা টের পেয়ে যান। তিনি শুধু একাই নন, এত বড়ো সমুদ্রের সামনে গোটা মানবসমাজটাই কেমন যেন তুচ্ছ হয়ে যায়।

উদাসীন অথচ দুর্দান্ত সমুদ্র কখন যে কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে, কেউ তা বলতে পারে না আগে থেকে। একেবারে শান্ত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ওপরেও আস্থা রাখা যায় না সব সময়। যে-কোনও মুহূর্তেই উত্তাল হয়ে উঠতে পারে সমুদ্র। ভয়ংকর ঝড়-তুফানে সোলো ডুবে গিয়েছে সমুদ্রে, কিন্তু এর একমাত্র যাত্রীটি ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গিয়েছেন। ডুবন্ত সোলো থেকে কালাহান কোনওমতে আশ্রয় নিয়েছিলেন রবারের ভেলায়।

তারপর? তারপরেই তো রোমহর্ষক এক কাহিনি!

কালাহানের আত্মীয়, বন্ধু ও সাগররক্ষীদের সবাই ধরে নিয়েছিলেন— দুর্ঘটনায় মারা গেছেন মানুষটি। অনুসন্ধান চালাবার নির্দিষ্ট সময়টুকু পেরিয়ে যাওয়ার পরে সবাই বুঝে গিয়েছিলেন, নিখোঁজ যাত্রীটি আর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু অঘটন আজও ঘটে। আজও মাঝেমধ্যে কল্পকাহিনির চাইতেও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে সত্যি ঘটনা। ঠিক এমনই এক ঘটনা হল অকূল সমুদ্রে তুচ্ছ ভেলায় চেপে কালাহানের বেঁচে থাকা! এক-আধটা দিন নয়, সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর দিন।

কী ভাবে বেঁচেছিলেন কালাহান?

কাহিনিটি জানার পরে সবাই একমত : আজকের সমুদ্র-জীবনের সবসেরা অ্যাডভেঞ্চার হল স্টিভেন কালাহানের বেঁচে থাকার এই লড়াইটি।

সমুদ্রে জাহাজ, নৌকো ডোবার নানা রোমহর্ষক কাহিনি আছে। কী হয়েছিল সেই রবার্টসনদের? ১৯৭২ সালে তাঁদের উনিশ টন ওজনের স্কুনার ডুবিয়ে দিয়েছিল বিশাল এক তিমি। পাঁচ-সদস্যের পরিবারটি এবং একজন ক্রু পরের আটত্রিশ দিন ভেসেছিলেন সমুদ্রে। তাঁদের ভেলাটা টিকেছিল মাত্র সতেরো দিন, বাকি দিনগুলো কেটেছিল ডিঙিতে।

বেলিদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। তিমি মাছের ধাক্কায় তাঁদের ক্রুজার ডুবেছিল গভীর সমুদ্রে। তারপর ছোট্ট দুটি নৌকোয় অনেকগুলি দুঃসহ দিন কাটাবার পরে উদ্ধার পেয়েছিলেন তাঁরা। একা একটি মানুষের সুদীর্ঘকাল সমুদ্রে ভেসে থাকার আর একটিমাত্র কাহিনি আছে ইতিহাসে। যাত্রীটির নাম পুন লিম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় টর্পেডোয় তাঁর জাহাজ ডুবেছিল। সামান্য একটি ভেলায় চেপে বহুদিন কাটাবার পরে উদ্ধার পেয়েছিলেন তিনি।

www.BanglaBook.org

একদা আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামের একজন নাবিক জাহাজডুবির পরে চিলির কাছে জনমানবশূন্য একটি দ্বীপে কয়েক বছর কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। রোমাঞ্চকর ওই কাহিনিটি ফলাও করে ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ওই কাহিনিটি অবলম্বন করে ড্যানিয়েল ডিফো লিখেছিলেন তাঁর ভুবনবিখ্যাত উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো।' কালাহানের জীবনের ভয়ংকর এই ঘটনাটি ভবিষ্যতের কোনও ক্লাসিকের বিষয় হয়ে উঠবে কি না কে জানে!

কালাহানের এই কাহিনি সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস-এর মন্তব্য: নিদারুণ দুঃখকষ্টকে অগ্রাহ্য করে অসাধারণ এক সাহস ও স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন নাবিক। কারও-কারও মতে বিস্ময়কর এই বৃত্তান্তটি 'আধুনিক এক মহাকাব্য'।

কালাহানের আরও দুটি পরিচয় আছে। তিনি সুলেখক ও কুশলী চিত্রকর। অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার কয়েকটি ছবিও এঁকেছেন তিনি। কিছু-কিছু ছবি সংক্ষেপিত এই অনুবাদ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

নানা জায়গা থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল কালাহানকে। অভিনন্দনের উত্তরে কালাহান লাজুক মুখে একটি কথাই বলেছেন সর্বত্র। বলেছেন : সমুদ্রে ভেসে থাকার সময় আমি বাঁচার জন্যে লড়াই করেছি। কাজটা বীরপুরুষের মতো হবে বলে নয়, ওই মুহূর্তে ওটাই ছিল আমার কাছে সবচাইতে সোজা কাজ। মরার চাইতে বাঁচার চেষ্টা করা সোজা।

BanglaBook.org

শৈবাল বসু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

নাপোলেয়ঁ সোলোর বৃত্তান্ত

শেষ রাত। ঘন কুয়াশায় চারদিকের কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। গত চার দিন ধরে কুয়াশার এই দাপট চলেছে সমানে। উত্তাল সমুদ্রে নাপোলেয়ঁ সোলো কোনওমতে এগিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের উপকূলের দিকে। এখন আমরা নিশ্চয়ই সিলি দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি। খুব সাবধানে এগোতে হবে এবার। ভরা জোয়ার, জলে প্রচণ্ড স্রোত। শুনেছি, জাহাজ চলাচলের এই পথটিতে ভিড় লেগেই থাকে।

ক্রিস আর আমি সতর্ক চোখে চারদিক দেখার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ বাতিঘরের উজ্জ্বল আলো ঘুরে গেল সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ওই আলোর ঝলকানিতে বিশাল-বিশাল ঢেউ দেখতে পেয়েছিলাম। তা হলে তীরের খুব কাছে এসে গিয়েছি। নৌকোর পাল ছোটো করলাম আমরা। চারপাশে ভয়ংকর সব পাথরের চাঁই।

এইসব পাথরের ধার দিয়ে এগোতে হচ্ছিল খুব সাবধানে। বাতিঘরের আলো দেখে হিসেব করলাম তীর থেকে ঠিক কতটা দূরে আছি আমরা! ওই আলো তিরিশ মাইল এলাকা জুড়ে ঘুরছে। কপাল ভালো বলতে হবে, কুয়াশা এখন আমাদের মেন-এর সাগরের মতো ঘন নয়। পথ অবশ্য খুব দুর্গম। ১৮৯৩ সালের নভেম্বরে এইসব পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা খেয়ে কম করে ২৯৮টি জাহাজ টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এ-হিসেব আবার একটিমাত্র মাসের।

পরদিন সকালে ঘন কুয়াশার পর্দা সরে গেল সামনে থেকে। হাওয়া বইছিল ঝিরঝির করে। পেনজান্সের কাছে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম এই উপকূলটি বেশ বিপজ্জনক। বিশাল মাপের সব ঢেউ ক্রমাগত আছড়ে পড়ছিল কর্নওয়ালের গ্রানাইটে। এখানকার এই তাণ্ডবে ধ্বংস হয়েছে বহু জাহাজ। প্রাণহানির ঘটনাও কম নয়। ছড়ানো-ছেটানো রাক্ষুসে এই পাথরগুলোর একটা নাম লিজার্ড।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল আস্তে-আস্তে। রোদ্দুরের মুখ দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র এখন ঠিক লক্ষ্মী মেয়ের মতো। অল্প দূরের পাহাড়গুলোর মাথায় সুবজের সমারোহ। অ্যাজোর্স থেকে দীর্ঘ দুটি সপ্তাহ গভীর সমুদ্রে ভেসেছি আমরা। লোনা জলের বাতাসে ভর্তি হয়ে আছে ফুসফুস। হঠাৎই সামনের ওই ডাঙার গন্ধ ভেসে এল হাওয়ায়। আহ্! কী মিষ্টি গন্ধ ! প্রতিটি সমুদ্রযাত্রার শেষের দিকে এসে মনে হয়, রূপকথার শেষ পাতাটায় পৌঁছে গিয়েছি। এবারও ঠিক তাই মনে হল। তবে এবারের মনে হওয়ার বোধ বেশ তীব্র ছিল।

আমার লম্বা সফরের একমাত্র সঙ্গী ক্রিস বন্দরে নৌকো ভেড়াবার তোড়জোড় করছিল। আমিও এবার হাত লাগালাম। সোলো অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করে তীরে এসে পৌঁছেছে। পনেরো বছর আগে যে স্বপ্নটি আমি প্রথম দেখেছিলাম, সেটি

www.BanglaBook.org

সফল হল অবশেষে। রবার্ট ম্যান্‌রি আমাকে শুধু স্বপ্ন দেখতেই শেখাননি — সেই স্বপ্নকে কী করে সত্যি করে তুলতে হয়, তাও শিখিয়েছেন। ম্যান্‌রি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন টিংকারবেল নামের ছোট্ট একটি নৌকো অতলান্তিকে ভাসিয়ে। আর আমি সেই কাজটিই সারলাম সোলোয় চেপে।

ক্রিস আর আমি তীরে উঠলাম লাফিয়ে। শুল্ক বিভাগের ঝামেলা মিটলেই কাছাকাছি কোনও পানশালায় গিয়ে বসতে হবে। মুখ ঘুরিয়ে সোলোকে দেখলাম একবার। মনে হল, সোলো আর আমার মধ্যে কোথাও কোনও অমিল নেই। সোলোর পরিকল্পনা আমার, আমিই ওকে বানিয়েছি, তারপর আমিই ওকে নিয়ে ভেসে পড়েছি সমুদ্রে। আমার সবকিছু এখন আবার ওর মধ্যেই। জীবনের এই পরিচ্ছেদটি একসঙ্গেই শেষ করলাম আমরা। এবার নতুন স্বপ্ন দেখার পালা।

ক্রিস বিদায় নেবে শিগগির। তারপর সোলোকে নিয়ে আমি ভেসে পড়ব একাই। মিনি-ট্রান্‌স্যাট (ট্রান্‌স্ অ্যাটলান্টিক) রেসে যোগ দিচ্ছি আমি। যাকগে, ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন শুধু আনন্দ করার সময়।

মিনি-ট্রান্‌স্যাট রেসে শুরু হচ্ছে পেনজান্স থেকে। শেষ হবে ক্যানারিজ হয়ে অ্যান্টিগুয়ায়। ক্যারিবিয়ানেও যেতে চাই আমি। সামনের শীতে একটা কাজ জোটাতে হবে ওখানে। সোলো দ্রুতগতির ক্রুজার। প্রতিযোগিতায় কেমন করে দেখার খুব আগ্রহ আছে আমার। সব দিক থেকেই সোলো চমৎকার, সুতরাং দৌড়ে জিতে যাওয়া অসম্ভব কোনও ব্যাপার নয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে কয়েকজন দৌড়ের তোড়জোড় নিচ্ছিল নানাভাবে। ওদিকে আমি তখন মনের সুখে ওখানকার প্যাস্ট্রি, মাছ আর ভাজাভুজি খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম।

এই সময় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা নিছক কোনও মজার ব্যাপার নয়। শরতের বিষুবলম্ব, দিন-রাত্তিরের মাপ এখন সমান। ঝড়টড় উঠছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে প্রচণ্ড দুটো ঝড় বয়ে গেছে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে। ঝড়ের ধাক্কায় বিশাল চিড় ধরেছে জাহাজের গায়ে। ঝড়ের জন্যেই প্রতিযোগীদের অনেকে পৌঁছতে পারেননি সময়মতো। একটা ফরাসি নৌকো ডুবেছে, তবে কপালজোরে বেঁচে গেছেন নাবিকরা। আর-এক ফরাসির মন্দভাগ্য, তাঁর শরীর আর নৌকো থেঁতলে গেছে লিজার্ডে। মর্মান্তিক ওই ঘটনার ছায়া পড়েছিল সবার ওপর।

আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। কেউই বলতে পারছিল না নির্দিষ্ট দিনে প্রতিযোগিতা শুরু করা যাবে কি না! তার চেয়েও বড়ো কথা, এই সময় জলে ভাসা ঠিক হবে কি? প্রশ্নটিকে ঘিরে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

শেষে উদ্যোক্তারা বললেন : দেখুন, দিন পিছিয়ে দিলে প্রতিযোগিতা এবার হয়তো আর শুরুই করা যাবে না। এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, এখন যদি আবার ...। কিছুটা এগোবার পরে আবহাওয়া তো ভালো হওয়ার কথা। যাত্রা বরং শুরু করেই দেওয়া যাক।

বেশ, তাই হোক তবে।

www.BanglaBook.org

যাত্রার দিন পেনজান্সের বন্দর-এলাকা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল লোকজনে। কথা, হাসি আর কান্না। ছবি তোলা হচ্ছিল প্রচুর। একটু পরে অবশ্য প্রতিযোগীরা বাদে বাকি সবাই ফিরে যাবে তাদের উষ্ণ ঘরে।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। তবে তার মধ্যেই এক সময় বন্দর-প্রধান বন্দরের সুবিশাল স্টিলের গেট খুলে দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম স্টার্টিং-লাইনের দিকে। আমি আর সোলো দুজনেই ষোলো আনা তৈরি। অন্যান্য প্রতিযোগীরাও প্রস্তুত। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে বন্দুক গর্জে উঠতেই শুরু হল দৌড়।

রাত্তিরে ঝোড়ো হাওয়া উঠল। সে কী হাওয়া! উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হল নৌকোগুলোর। মাঝেমধ্যে অন্যান্য নৌকোর আলো চোখে পড়ছিল। কিন্তু সকালে একটা নৌকোও দেখতে পেলাম না। তবে সকালের চেহারাটা বেশ। রাত্তিরের বিচ্ছিরি ওই আবহাওয়ার লেশমাত্র নেই।

অকূল সমুদ্রে এগিয়ে চলেছিল সোলো। আরে! ওটা কী? সাদা একটু ত্রিভুজের মতো! ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে আড়ালে। সোলোকে ছোটালাম ওদিকে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে কাছাকাছি পৌঁছতেই চিনতে পারলাম বস্তুটাকে। অ্যালুমিনিয়ামের নৌকো, পেনজান্সে এটা আমার পাশেই ছিল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দুই ইতালিয়র একজন চালাচ্ছেন এই নৌকোটা। অধিকাংশ প্রতিযোগীর মতো এই মানুষটিও বেশ হাসিখুশি। তবে এখন একটু অসুবিধেয় পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। পালের একটা অংশ আছাড় খাচ্ছিল ডেকের ওপর। চেঁচিয়ে ডাকলাম কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছবি তুললাম নৌকোটার। তারপর চালকের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম বহুক্ষণ ধরে। কিন্তু না, কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। চালক ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়।

রাত্তিরে জানা গেল আসল খবরটা। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এক প্রতিযোগীর কথা হচ্ছিল বেতারে। তাতেই জানতে পারলাম ওই নৌকোটি ডুবেছে, তবে উদ্ধার করা হয়েছে ইতালীয়টিকে। আমি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন উনি বোধহয় নৌকোর মেরামতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

তৃতীয় দিন। মাইলখানেক দূর দিয়ে একটা মালবাহী জাহাজ পেরিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। ওই জাহাজের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করলাম। কথায় কথায় জানা গেল : প্রতিযোগিতায় অংশ-নেওয়া মোট ছাব্বিশটি নৌকোর বাইশটি আছে আমার পেছনে। এ-খবর আমাকে উৎসাহিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

আস্তে-আস্তে বাতাসের গতি বেশ বেড়ে উঠেছিল। সোলো এখন উত্তাল সমুদ্রে। সামনে দুটো পথ। কোন পথটা ধরা ঠিক হবে? শেষ পর্যন্ত ভয়ংকর বে অব বিস্কের পথই বেছে নিলাম। একটু বাদে বাতাসের গতি বেড়ে গেল আরও। বেশ বড়ো-বড়ো ঢেউ উঠছিল, এক-একটার মাপ কম করে ফুট-দশেক হবে। ওই সব ঢেউয়ের মাথা থেকে ক্রমাগত নীচে আছড়ে পড়ছিল সোলো।

www.BanglaBook.org

চালকের আসন আঁকড়ে বসেছিলাম কোনওমতে, যে-কোনও মুহূর্তে ছিটকে পড়তে পারি সমুদ্রে। নৌকোর খোলের ওপর তীব্র জলধারার কানফাটানো আওয়াজ। জিনিসপত্র সব গড়াগড়ি খাচ্ছিল পাটাতনের ওপর। একটা বোতল ভেঙে তেল ছিটকে গেছে চতুর্দিকে। দীর্ঘ আট ঘণ্টা ধরে ওই তাণ্ডব চলেছিল। অকথ্য আয়ত্তে আসার পরে কোনওমতে বাঙ্কে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পাহাড়ের মতো ঢেউ

ঘুম ভাঙল অদ্ভুত এক অকথ্যর মধ্যে। দেখি, আমার ফাউলওয়েদার গিয়ার এক হাঁটু জলের ওপরে ভাসছে! লাফিয়ে নামলাম বাঙ্ক থেকে। সর্বনাশ ! নৌকোর খোল ফেটে গেছে এক জায়গায়। ওখান থেকে জল ঢুকছিল তোড়ে। জলের চাপে ফাটল বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। এখন বোধহয় ডোবার মুখে সোলো।

www.BanglaBook.org

অবিকল বেজির গতিতে কাজে নেমে পড়লাম আমি। নৌকোর পাল নামানো হল। তারপর কাঠের টুকরো কেটে শুরু হল মেরামতির কাজ। কপাল ভালো, বিপদ এড়ানো গেল এবারের মতো। নৌকোর অবস্থা সামাল দেওয়ার দু-দিন বাদে হাজির হলাম স্পেনের উপকূলে।

ঢেউয়ের আঘাতে আছড়ে পড়লাম

লা কোরুনায় আমি পৌঁছবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিনি-ট্রান্স্যাট রেসের আরও সাতখানা নৌকো এসে হাজির হল ওখানে। মালবাহী জাহাজে ধাক্কা খেয়েছে দুটো নৌকো, একটার রাডার ভেঙে গেছে, বাকিগুলোর অবস্থা শোচনীয়।

সোলো বোধহয় সমুদ্রের আবর্জনারাশির মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। খোলের নীচের অংশ পুরু, ভারী কিছুর ধাক্কায় তুবড়ে গেছে। হয়তো গাছের মস্ত কোনও গুঁড়িতে ধাক্কা

www.BanglaBook.org

খেয়েছে। সমুদ্রে এমন গুঁড়ি আমি বিস্তর দেখেছি, এমনকি আস্ত গাছ ভেসে যেতেও দেখেছি বেশ কিছু।

সমুদ্রের নাবিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছে। সমুদ্রের জলে কী না ভেসে যেতে দেখেছে ওরা! এর মধ্যে আছে ট্রাক বয়ে নিয়ে যাওয়ার মস্ত সব খাঁচা। এগুলি জলে পড়েছে জাহাজ থেকে। ওই খাঁচা থেকে কাঁটাওয়ালা স্টিলের বল — সবকিছুই ওরা দেখেছে সমুদ্রের জলে। স্টিলের বলের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত মাইনের মিল আছে বেশ। একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় আস্ত একটা রকেট সমুদ্রে ভাসতে দেখেছিল নৌকোর এক চালক।

প্রতিযোগিতার বাইরে ছিটকে গিয়েছি আমি। ও-ব্যাপারে এখন আর কোনও দায়দায়িত্ব নেই আমার। তবে সমস্যা আছে অন্যত্র। নৌকো সারাবার ব্যবস্থা নেব কী ভাবে? একবিন্দু স্প্যানিশ জানি না। একজন ফরাসিকে পেলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত, কিন্তু তেমন কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না ধারে-কাছে। পয়সাকড়িও বিশেষ নেই।

নৌকো ভরে আছে সমুদ্রের জলে। জলে ভাসছে রান্নার তেল। ভাঙা কাচের টুকরো এদিক-সেদিক। আমার ইলেকট্রনিক সেলফ্-স্টিয়ারিং পুড়ে কালো হয়ে গেছে। এই তো অবস্থা, এর মধ্যে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম হঠাৎ। ১০৩ ডিগ্রি জ্বর। শেষে চারপাশের ওই আবর্জনার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিলাম হতাশ হয়ে।

অন্যান্যদের তুলনায় আমার কপাল ভালোই বলতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ-নেওয়া নৌকোগুলোর মধ্যে পাঁচটা অন্তত ডুবে গেছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে প্রতিযোগীরা রক্ষা পেয়েছেন। মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশি প্রতিযোগী অ্যান্টিগুয়ার সমাপ্তিরেখায় পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না।

সোলোকে সারিয়ে তুলে আবার সমুদ্রে নামাতে চার-চারটে সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল। টাকাপয়সা, খাবারদাবার যা আছে তাই দিয়ে ক্যারিবিয়ানে পৌঁছতে পারব কি না জানি না। শুধু এটা জানি, এই পুঁজিতে দেশে ফেরা অসম্ভব। তবে ভাগ্য ভালো। এখানকার 'ক্লাব নটিকো দে লা কোরুনা' একটা পয়সাও খরচা করতে দেয়নি আমাকে। বলেছে 'কিচ্ছু লাগবে না। নিঃসঙ্গ মানুষকে আমরা সাধ্যমতো সাহায্য করে থাকি।'

টানা চার সপ্তাহ ঝড়ের দাপট চলল ফিনিসটারে। বন্দর নাবিকে বোঝাই, দক্ষিণে যেতে চায় সবাই। ওদিকে মরশুম শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। রোজ সকালেই তুষারপাত হচ্ছিল। ওই তুষার গলতে সময় লাগে বেশ। এ-সবের মধ্যেই সোলো আস্তে-আস্তে ফিনিসটার পেরিয়ে এল।

ক্রু হিসেবে একজন ফরাসি মহিলাকে সঙ্গে নিয়েছি আমি। ভদ্রমহিলার নাম ক্যাথেরিন পুজে। এই যাত্রায় নৌকো চালানোয় সাহায্য করার জন্যে একজন কারও প্রয়োজন ছিল আমার। সমুদ্র সফরে ক্যাথেরিনের একটিমাত্র পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। অভিজ্ঞতাটি অবশ্য সুখের নয়, বে অফ বিস্কেতে বিপদে পড়েছিল ওদের নৌকো। সেই বিপদ থেকে ওদের উদ্ধার করে একটি ট্যাঙ্কার।

www.BanglaBook.org

সুন্দরী ক্যাথেরিন আমার ছোটো নৌকোটিকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছিল। ভেবেছিলাম ওর সাহায্যে দিন-চোদ্দর মধ্যে ক্যানারিজে পৌঁছে যাব।

কিন্তু চার সপ্তাহ ধরে আস্তে-আস্তে লিসবনের দক্ষিণ দিকে এগোলাম আমরা। পশ্চিম বায়ুতে আয়নার মতো সমুদ্রে দ্রুত যাওয়া কঠিন। ঝকঝকে জলে আমার প্রতিফলন দেখে টের পেয়েছিলাম, তেমন কোথাও আর যাওয়া হয়ে উঠছে না। আমার নাবিক-জীবনের দ্রুতগতিতে যেন একটা ছেদ এসেছে হঠাৎই। তবে একটা ভালো ব্যাপার, মিনি-ট্রান্স্যাট দৌড় শেষ করতে না পারার হতাশা প্রায় কাটিয়ে উঠেছি আমি।

পর্তুগালের উপকূলবর্তী এলাকা ধরে এগিয়ে চলেছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে কোথাও কোনও উত্তেজনা ছিল না। আমারও কোনও ব্যস্ততা নেই। উদ্বেগহীন জীবনের প্রশান্তি কেমন যেন স্পঞ্জের মতো সারা শরীর দিয়ে টেনে নিচ্ছিলাম আমরা। ক্যানারিজে পৌঁছনো ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য নেই আমার। তারপর ওখান থেকে আবার একাই ভেসে পড়ব সমুদ্রে।

লিসবন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল চমৎকার আবহাওয়ায়। ওখান থেকে পৌঁছলাম মেদিরায়। তারপর সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার পরে গেলাম তেনেরিফের দক্ষিণে। আমাদের দু-সপ্তাহের সফর শেষ হল ছ-সপ্তাহ ফুরোবার পরে। ক্যাথেরিনকে বিদায় জানালাম। আবার সেই আমি আর আমার নৌকো মুখোমুখি।

সব বন্দরেই সোলোর বেশ খাতিরযত্ন জুটত। স্থানীয় লোকজন বিশাল মাপের দামি-দামি ইয়াট দেখেছে। এদের কাছে সোলো একেবারেই নতুন। ভাল্লুক যে-ভাবে মধুর কাছে ছুটে যায়, ঠিক সেই ভাবেই তারা ছুটে আসত সোলোর কাছে। এইটুকু একটা নৌকো সুদূর আমেরিকা থেকে এখানে এসেছে — এ তথ্যটা ওরা যেন আর বিশ্বাসই করে উঠতে পারত না! ছোট্ট একটি বন্দরে স্থানীয় জেলের দল আর নৌকো বানাবার লোকজন রোজ সকালে আমার নৌকোর পাশে এসে হাজির হত। তাদের প্রশ্ন আর কৌতূহলের কোনও শেষ ছিল না। ভাঙা-ভাঙা স্প্যানিশ আর হাতের মুদ্রায় তাদের গল্প শোনাতে হত আমাকে।

শীতে নোঙর করে রাখতে হবে সোলোকে। কিন্তু তার আগে কিছু-একটা করা দরকার। নিছক পর্যটকের মতো ঘোরাফেরা করলে চলবে না। কাজ খুঁজতে হবে। যৎসামান্য টাকাপয়সা পড়ে আছে শুধু। দেনাও আছে কিছু, সেটা শোধ করার কথাও তো ভাবতে হবে।

নাবিকের সেই অবধারিত দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার সময় মনে হয়, বন্দরে পৌঁছতে হবেই। রসদের প্রয়োজন, উষ্ণ আশ্রয়েরও প্রয়োজন। কিন্তু বন্দরে পৌঁছবার পরে শুরু হয় আর-এক সমস্যা। ভালো খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়েকটা রাত্তির শুকনো বিছানায় শোবার পরে সমুদ্রের ডাক শোনা যায় আবার। সমুদ্র ডাকছে। এ-ডাক অগ্রাহ্য করা যায় না। মাটি মাতৃরূপা, তাকে তোমার প্রয়োজন; কিন্তু সমুদ্রকে যে তুমি ভালোবাস।

www.BanglaBook.org

অধিকাংশ বন্দরেই এমন কিছু ক্রু পাওয়া যায় যারা তোমার পথেরই যাত্রী। কিন্তু এবার তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। শীতকালটা যারা ক্যারিবিয়ানে কাটাতে চায় তাদের অধিকাংশই রওনা হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। তবে এই যাত্রায় একা থাকলেও কোনও অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আমার এক নতুন বন্ধু আমার নৌকোর সেল্‌ফ-স্টিয়ারিং গিয়ারটি সারিয়ে দিয়েছেন। পাইলট-চার্টটিও চমৎকার। ঝড়ের আশঙ্কা মাত্র দুই শতাংশ। সুতরাং আশা করা যেতে পারে, সফরটি বেশ নির্ঝঞ্ঝাটের হবে।

নৌকো এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে

রওনা হওয়ার দিন সঙ্গের শেষ পেসেতাগুলো উপুড় করে দিয়ে পানীয়র অর্ডার দিলাম। তারপর ভাঙাচোরা স্প্যানিশে পরিচিত বারটেন্ডারকে বললাম, "এই পয়সাগুলো তো আর সমুদ্রে কোনও কাজে আসবে না।"

লোকটি সহৃদয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে এখন?"

জবাব দিলাম ওই ভাষাতেই। "ক্যারিবিয়ানে। কাজ চাই। পেসেতা শেষ।"

কিন্তু এইটুকু নৌকোয়! "নো প্রবলেমা?"

হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, "নো, নো প্রবলেমা। কোনও সমস্যাই নেই।"

www.BanglaBook.org

২৯ জানুয়ারির রাতটা বেশ পরিষ্কার ছিল। আকাশে ঝকঝকে তারা। সোলোকে নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লাম আমি। নৌকোর মুখ ক্যারিবিয়ানের দিকে। সমুদ্রে আবার ভেসে পড়তে পেরে খুব ভালো লাগছিল আমার।

অনাবৃত স্নায়ু

নাবিকদের কপালে যা খুব একটা জোটে না, এখন আমার তাই জুটেছে— অর্থাৎ শান্তি। শান্ত সমুদ্র ও সুবাতাস অসীম মমতায় ঘিরে রেখেছিল আমার নৌকোটিকে। এ যেন ঠিক মায়ের যত্ন। এই যত্নের মধ্যে নাচতে-নাচতে অ্যান্টিগুয়ার দিকে এগিয়ে চলেছিল আমার নৌকো — সোলো। সমুদ্রে আমি বেশ সহজ-স্বাভাবিক বোধ করে থাকি, তবে এই সমুদ্রই আবার আমার সম্ভ্রম আদায় করে নেয়।

সমুদ্র আমার কাছে পুরনো এক বন্ধুর মতো। তবে ঘন-ঘন চেহারা পালটাতে পুরনো বন্ধুটির কোনও জুড়ি নেই। আর, চমক ছাড়া ও যেন এক পা-ও চলতে চায় না।

নির্দিষ্ট বিরতিতে একই মাপের ছোট্ট-ছোট্ট ঢেউ দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল সোলোকে। এ যেন এক অলস-ভ্রমণ! মৃদু বাতাসে আমার হাতে-ধরা উপন্যাসের পাতা উড়ছিল। ওদিকে ঝকঝকে রোদে পুড়ে-পুড়ে তামাটে হয়ে যাচ্ছিল আমার গায়ের চামড়া।

পুরনো দিনের ইতিহাসের টুকরো-টুকরো নানা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। এই পথেই একদা নাকি জাহাজবোঝাই বিস্তর দাস চালান যেত! পথ মানে ক্যানারিজ থেকে ক্যারিবিয়ান।

অখণ্ড অবসর। সময় কাটাবার জন্যে বই পড়ি। পড়তে ভালো না লাগলে লেখালেখি করে থাকি একটু-আধটু। চিঠি লিখি, ছবি আঁকি; ছবি তুলি ক্যামেরায়। খাবারদাবারের রসদ আমার কম নেই। ইচ্ছেমতো আলুভাজা, পেঁয়াজ, ডিম, চিজ ইত্যাদি খাই। নিয়মিত শরীরচর্চা করি, ডন-বৈঠক দিই। অল্পবিস্তর যোগব্যায়ামও আছে আবার এর মধ্যে। যাই হোক, আমি আর সোলো বেশ বহাল তবিয়তেই আছি। কপাল ভালো থাকলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই।

৪ ফেব্রুয়ারি। বাতাস হঠাৎই বেশ জোরালো হয়ে উঠল। বাতাসে শিসের শব্দ। এ বোধহয় ঝড়ের পূর্বাভাস। আস্তে-আস্তে কালো মেঘে ছেয়ে গেল গোটা আকাশে। সমুদ্র উত্তাল। বিশাল-বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছিল সোলোর গায়ে। একটু আগের উদ্বেগহীন সেই সমুদ্রযাত্রায় কখন আবার ফিরে আসতে পারব কে জানে ! কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এসো, ইচ্ছে হলে আঘাত করো আমাকে, তারপর বিদেয় হও দয়া করে।"

ইলেকট্রিক অটোমেটিক পাইলট সোলোকে সামলাচ্ছে এখন। একটানা বহুক্ষণ চালু থাকার ফলে মোটর থেকে কেমন যেন ক্লান্তির শব্দ বার হচ্ছিল। গোটা পরিবেশটাই বিচ্ছিরি, কিন্তু আমার খুব একটা খারাপ লাগছিল না। মুভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে

www.BanglaBook.org

মজা করছিলাম আমি, সসেজ চিবোচ্ছিলাম, আর মাঝেমধ্যে বিখ্যাত সেই লং জন সিলভারের বুলি আউড়ে যাচ্ছিলাম নিজের মনে।

সন্ধে হতে-না-হতেই গাঢ় অন্ধকার নেমে এল আকাশ থেকে। বিরাট-বিরাট ঢেউয়ের ওপর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সোলো। একটু বাদে সূর্য ডুবতেই চারদিক

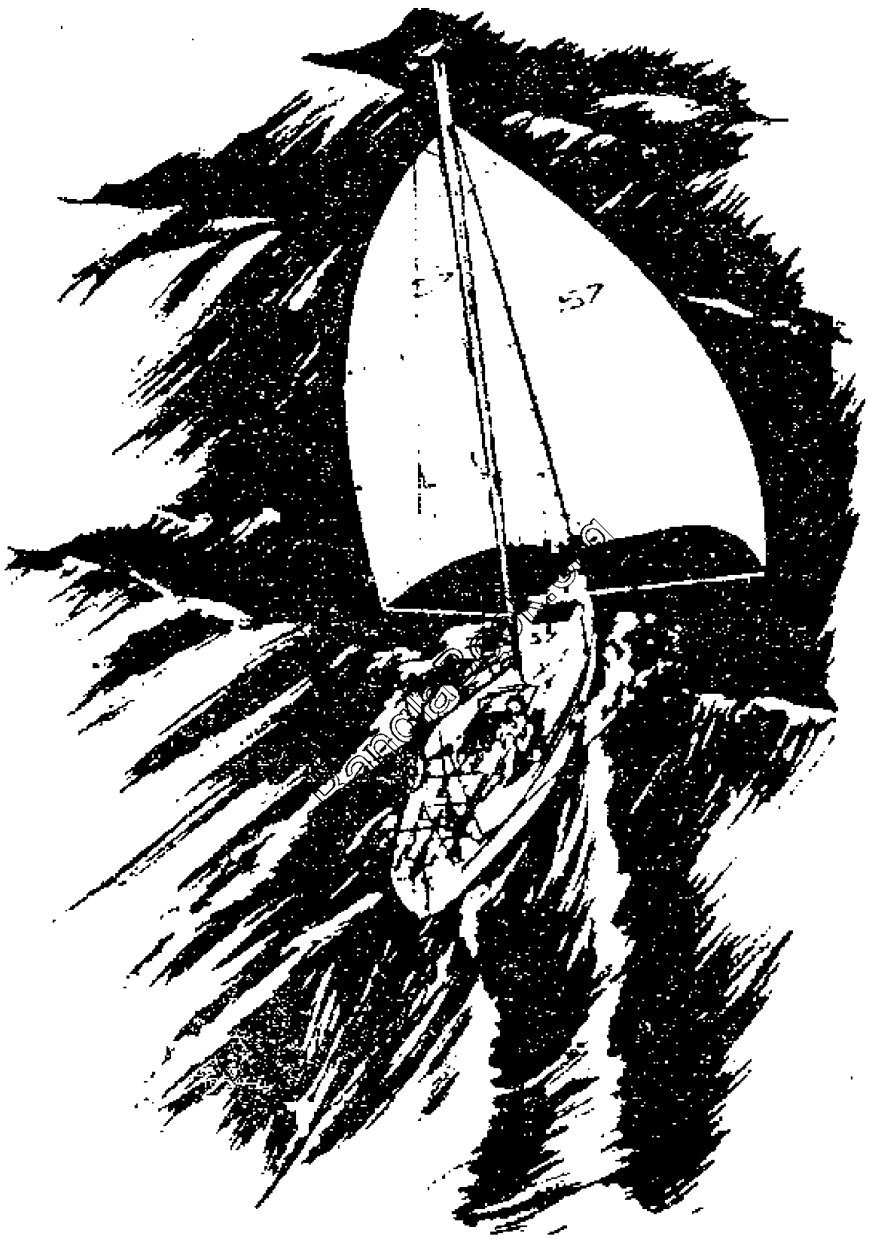

ভয়ংকর ওই দুর্ঘটনার ঠিক আগে

একেবারে কালো হয়ে গেল। রাতের দিকে ঝড় আর ঢেউ বেড়ে উঠল অস্বাভাবিক ভাবে।

এই সোলোয় চেপে আমি দশ হাজারেরও বেশি মাইল ঘুরেছি। এর সঙ্গে আছে দেড় দফা অতলান্তিক পরিভ্রমণ। সোলো তার সুদীর্ঘ যাত্রায় এই সমুদ্রের চেয়ে বেশি খারাপ

www.BanglaBook.org

চেহারা দেখেছে। সুতরাং ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। প্রয়োজন দেখা দিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

সোলো এখন অসম্ভব দুলছে! এই দুলুনির মধ্যে খাবারদাবার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই কঠিন। তবে উপায় নেই, অনেক কষ্টে কঠিন কাজটা সারতে হল আমাকে। শেষে, দুলন্ত কাপ থেকে কিছুটা গরম কফিও চালান করে দিলাম গলার মধ্যে।

দু-দিন বাদে আমার জন্মদিন। জন্মদিনে কী ধরনের ভোজের আয়োজন করব — তাও ভেবে নিলাম একফাঁকে। ওভেন নেই, সুতরাং কেক বানানো যাবে না। তবে কেকের বিকল্প হিসেবে চকোলেট বোধহয় মন্দ নয়।

এটা অবশ্য পরের কথা। আর, পরের কথা পরে ভাবাই ভালো। উথালপাথাল হচ্ছিল সমুদ্র। তবে সমুদ্রে বিপদ ঠিক কখন আসে — কেউ বলতে পারে না আগে থেকে। বিপদ আসতে পারে আচমকা, কিংবা বহুক্ষণ ধরে সতর্ক করে দেওয়ার পরে। ভয়ংকর সমুদ্রেই যে সব সময় অঘটন ঘটে, তা নয়। ঠান্ডা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রেও বিপদ দেখা দিতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। শান্ত অথবা অশান্ত দু'ধরনের সমুদ্রেই বিপদে পড়েন নাবিকরা। কিন্তু কোনও রকমের ঘৃণা বা বিদ্বেষ থেকে সমুদ্র কাউকে আঘাত করে না।

সমুদ্রের রাগ নেই, দয়াও নেই। আসলে সমুদ্র কিছুটা উদাসীন প্রকৃতির। এই উদাসীনতার প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ নেই। বরং বলা যেতে পারে, এইজন্যই আমি সমুদ্রে ভেসে পড়তে চাই বারবার। অকূল সমুদ্র আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির তুচ্ছতাকে দেখিয়ে দেয় স্পষ্ট করে। শুধু আমি কেন, সমগ্র মানবসমাজই এর মধ্যে পড়ে।

বিশাল-বিশাল ঢেউ ভেঙে পড়ছিল বিকট আওয়াজ তুলে। এই তাণ্ডবের মধ্যে সোলো। নিজের মনে বিড়বিড় করে বললাম — পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দূর অতীতের একটি কথা ভেসে এল আমার কানে। কথাটি হল, 'যতবারই এইরকম ভেবেছ, অবস্থা ততবারই সত্যি-সত্যি খারাপ হয়েছে।'

নৌকোটাকে পরীক্ষা করে নিলাম আর-একবার। গিয়ার, ডেক, খোল, জোড়ের মুখ ইত্যাদি সব ভালোই আছে।

গ্রিনউইচ মিন টাইমের হিসেবে এখন প্রায় ২২ ঃ ৩০। সমুদ্র উত্তাল, ঝড় বয়েই চলেছে, কিন্তু ওপরের ওই চাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা নেই। আকাশে স্থির হয়ে আছে সাদা, গোল চাঁদ। অবস্থার আরও অবনতি হলে দক্ষিণের দিকে এগোতে হবে। উপস্থিত কিছুই আর করার নেই।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে শুয়ে পড়লাম আমি। ২৩ ঃ ০০ নাগাদ উঠে পড়ে পোশাক পালটালাম। আমার গায়ে টি-শার্ট, হাতে ঘড়ি, গলার সুতোয় ঝোলানো তিমিমাছের দাঁতের একটা টুকরো। পরের আড়াই মাস এটা আমার গলাতেই ঝুলেছি।

প্রকাণ্ড সব ঢেউয়ের মাথায় আমার নৌকো পাহাড়ি ছাগলের মতো লাফাচ্ছিল। বাঙ্কের ওপরে শুয়েছিলাম আমি। তবে একে কি আর শোওয়া বলে? ঠিক যেন হ্যামকে দুলছিলাম।

www.BanglaBook.org

দুম্! বিকট এক কানফাটানো শব্দে আর সব শব্দ যেন চাপা পড়ে গেল। লাফিয়ে উঠলাম আমি। সমুদ্রের জল প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছিল আমার ওপর। কোত্থেকে আসছে এত জল? নৌকোর অর্ধেকটা কি ডুবে গেছে! মাথা ঠান্ডা করে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার সময়ও আর নেই বোধহয়। চার্ট-টেবিলের ওপর থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

জল কোমর ছুঁয়েছে আমার। নৌকোর সামনের দিকটা ডুবে গেছে একদম। ডুবে যাচ্ছে সোলো, ডুবে যাচ্ছে! এক্ষুনি ইমার্জেন্সি প্যাকেজ সংগ্রহ করা দরকার। কিন্তু মনের এই কথাটায় সায় দিতে পারছিল না শরীর। আমার মন আর শরীর — এই দুইয়ের মধ্যে এই মুহূর্তে যেন কোনও সম্পর্ক নেই!

নৌকো ডুবছে, ডুবে যাচ্ছে, শিগগির নিজেকে বাঁচাও। মনের এই কথাটার ধাক্কায় পাথরের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল। আমি আমার শরীরটাকে কোনওরকমে টেনে তুললাম ডেকের ওপর।

সমুদ্রের ঠান্ডা জল বয়ে যাচ্ছিল ডেকের ওপর দিয়ে। বাঁধন কেটে ভেলাটাকে বার করে আনতে হবে চটপট। গুহার মধ্যে শব্দের প্রতিধ্বনি যে-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আমার চিন্তাতরঙ্গও ছড়িয়ে পড়ছিল ঠিক সেই ভাবে। যথেষ্ট দেরি করে ফেলেছি। এবার বোধহয় মরার সময়। মৃত্যু ... সমুদ্রের অতলে ...আমার হদিশ আর পাবে না কেউ!

ভেলা ভাসাবার নিয়মকানুনগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। একশো পাউন্ডের ভারী ভেলাটা টেনে নামাতে হবে বোর্ডের ওপর। কিন্তু এই অবস্থায় ভারী কিছু নাড়াচাড়া করা বেশ কঠিন। সময় আর নেই। যা করার এক্ষুনি করতে হবে। প্রথম টান, দ্বিতীয় টান — না, একচুলও নড়ানো গেল না। তার মানে মরার আর দেরি নেই আমার। এটা মনে হতেই আর্তনাদ করে উঠে তৃতীয় টানটা দিলাম। কপাল ভালো, কাজ হল এবার।

ভেলা প্রস্তুত। একটু বাদে মস্ত একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ডেকের ওপর। ওই ঢেউয়ে ভেলা ভাসালাম আমি। মিনিটখানেকের মধ্যে সোলোর ঠিক আধখানা চলে গেছে জলের তলায়। ছুরিটা দাঁতে কামড়ে ভেলার মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম আমি।

চাঁদ ঠিক আগের মতোই উদাসীন চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে। চাঁদের কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের টুকরোয়। ওই ছায়া কি সোলোর মৃত্যুর ছায়া। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এতক্ষণ ধরে কোনওমতে সচল করে রেখেছিল আমাকে, কিন্তু এখন? দুর্ঘটনার বিচিত্র এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছিল আমার মধ্যে।

আমার ইন্দ্রিয়গুলো আর কখনওই বোধহয় এতখানি সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। যাবতীয় আবেগের প্রগাঢ় এক মিশ্রণও তৈরি হয়েছিল। নৌকো হারাবার দুঃখ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে গভীর এক হতাশাবোধ। তবে এ সব ছাপিয়ে উঠেছিল আর এক চিন্তা — এই যে এত ভাবাভাবি, এ-সবেই তো এখন অর্থহীন।

প্রচণ্ড শীতে জোর কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল সারা শরীরে। এই মুহূর্তে সভ্যতা থেকে বহু দূরে পড়ে আছি আমি। উদ্ধার পাওয়ার কোনও আশা নেই।

www.BanglaBook.org

বিচিত্র এক আতঙ্ক চেপে ধরেছিল আমাকে। কিন্তু এ ভাবে কতক্ষণ থাকা সম্ভব? লড়াই করতে হবে, বাঁচার জন্যে লড়াই; হয়তো বা শেষ লড়াই।

সোলো ডুবছে। সোলো মানে আমার সন্তান, আমার সঙ্গী, অতলান্তিক মহাসাগর রুটির ছোট্ট একটা টুকরোর মতো গিলে খাচ্ছিল আমার নৌকোকে। একের পর এক

উত্তাল সমুদ্রে নেপোলেয়ঁ সোলো

ঢেউ আছড়ে পড়ছে সোলোর ওপর। সাদা ডেক ভাসছে। সোলো এখনও পুরোপুরি ডোবেনি। ক্যান-ভর্তি জল এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র আমি ইতিমধ্যে চালান করে দিয়েছি ভেলায়। এ-সবই বেঁচে থাকার জন্যে জরুরি। তবে সংগ্রহ বাড়াতে হবে আরও।

www.BanglaBook.org

নানা কসরত করে অত্যাবশ্যক আরও কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করে ভেলায় তুললাম আমি। সোলোর মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি করা কিছু কক্ষ আছে। বায়ুভর্তি সেই কক্ষগুলো ভেসে থাকতে সাহায্য করছে নৌকোকে। কিন্তু এ ভাবে আর কতক্ষণ! সমুদ্রের বিশাল-বিশাল ঢেউয়ের হাতে ক্রমাগত মার খেতে-খেতে নির্জীব হয়ে পড়েছিল সোলো। নৌকোর মাথা ডুবে গেছে, পেছন দিকটা ভেসে আছে শুধু।

বাঁচার জন্যে আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে আনতে হবে সোলো থেকে। এদিকে নৌকো, ওদিকে ভেলা। রবার, প্লাস্টিক আর ট্যালকম পাউডারের গন্ধে নাক বুজে আসছিল আমার। তবে হাড়কাঁপানো শীতের কাছে ওই ঘটনাটি একেবারেই তুচ্ছ। নৌকোর মধ্যে কিছুটা ঢুকে পড়লাম আমি। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার। একই সঙ্গে আমি যেন নৌকো এবং সমুদ্রের মধ্যে।

অতি কষ্টে ইমার্জেন্সি-ব্যাগটা বার করে নিলাম নৌকো থেকে। কিন্তু ওই ব্যাগ ভেলায় তোলা বেশ শক্ত। গোটা পৃথিবীর পাপের বোঝার মতো মনে হচ্ছিল ব্যাগটাকে। এত ভারী ব্যাগ টেনেটুনে ভেলায় তোলা খুব কঠিন। তবে এই কঠিন কাজটাই সেরে ফেললাম কোনওমতে।

আর একবার ঢুকতে হবে নৌকোয়। আরও কিছু জিনিস জোগাড় করা দরকার। ঠান্ডা জলের মধ্যে ঢুকে গেলাম অনেকখানি। ওই তো, ওই তো একটা কুশন। কিন্তু ওটা সংগ্রহ করার সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার মাথায়। ওপর দিকে কিছুটা উঠে এলাম, কিন্তু নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, নক্ষত্রমণ্ডলীর শেষ নিশ্বাসটা আর কেউ যেন নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু না, নিশ্বাস নিতে পারলাম শেষ পর্যন্ত। আর একটা ঢেউ সরে যেতেই আলো-আঁধারি সমুদ্র ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ভেজা স্লিপিং-ব্যাগটাও নিয়ে নিলাম। ব্যাগটা গুটিয়ে নেওয়ার সময় মনে হচ্ছিল একগাদা সাপ কিলবিল করছে হাতের মধ্যে। স্লিপিং-ব্যাগ ভেলার মধ্যে ঢোকাবার পরে সোলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল আমার।

কিন্তু সোলো এখনও ভাসছে। সোলোর কেবিন থেকে কিছু-কিছু জিনিসপত্র বেরিয়ে এসে ভেসে যাচ্ছিল আমার ধার দিয়ে। তুলে নিলাম কয়েকটা। এ-সবের মধ্যে আছে একটা বাঁধাকপি, শূন্য একটা কফি-ক্যান আর একবাক্স ডিম। ডিমগুলো বেশিক্ষণ টিকবে না, তবু রেখে দিলাম।

না, আর কিছু করার শক্তি নেই আমার। ভেলার মধ্যে বসে আছি অবসন্ন হয়ে। পাশেই আধডুবন্ত সোলো। এই সোলোকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। ও অবশ্য নিজে থেকে চলে যেতে চাইলে বাধা দেওয়ার কোনও সাধ্য নেই আমার। লম্বা একটা দড়ি দিয়ে সোলোর এক প্রান্তের সঙ্গে বাঁধা আছে ভেলাটা। তবে বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়লে সোলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল কিছুক্ষণের জন্যে।

ঢেউয়ের আঘাতে ভেলার মধ্যে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম আমি। জল ছিটকে আসছিল। বাইরের অন্ধকারে সমুদ্রের প্রবল গর্জন। বেঁকেচুরে পড়ে আছি কোনওমতে। ভেলা

www.BanglaBook.org

অসম্ভব দুলছে। তাঁবুর দেয়াল আটকাচ্ছে ভয়ংকর ওইসব ঢেউ। হা-হা! কী দারুণ রসিকতা! যে সমুদ্র গ্রানাইটকে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দেয়, সেই সমুদ্রকে সামাল দিতে চাইছে তুচ্ছ একটা তাঁবুর দেওয়াল!

আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সমুদ্র। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। এই আঘাতে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ভেলা। তার মানে আমার মৃত্যু আসন্ন। মরতে যাচ্ছি আমি। এই রাতেই। সবচাইতে কাছের ডাঙা এখান থেকে প্রায় সাড়ে-চারশো মাইল দূরে। সমুদ্র নির্ঘাত আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ডুবিয়ে মারবে। কেউ সে ঘটনা জানতেও পারবে না। তীরে পৌঁছবার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ বাদে হয়তো খোঁজ পড়বে আমার।

ভেজা স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ভেলার নীচের অংশ এখন থই-থই করছে জলে। বরফ-ঠান্ডা মেঝের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে কুশন পেতে বসলাম। শীতে বেশ কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। একটু বাদে সামান্য উত্তাপ ফিরে এল শরীরে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে! তবে অপেক্ষা করার সঙ্গে-সঙ্গে নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে যাবে নানা ভাবনাচিন্তা। নতুন করে আবার হয়তো আতঙ্কগ্রস্তও হব!

ঢেউয়ের মাথায় ভেসে থাকতে-থাকতে সোলোকে দেখতে পেলাম। সোলোর আরও কিছুটা অংশ তলিয়ে গেছে জলের মধ্যে। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত ভেসে থাকো, তোমাকে ভালো করে দেখতে পাব আবার। দেখব, তোমার কতটা ক্ষতি করেছি আমি। ইশ্! ক্যানারিজে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলাম না কেন! আরও বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল আমার। অতলান্তিক দু-বার পার হওয়ার হাস্যকর আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যেই কি আমি তোমাকে জোর করে জলে নামিয়েছি? বেচারা সোলো, তোমার এই পরিণতির জন্যে আমার কষ্টের আর শেষ নেই!

একগাদা নুনজল খেয়ে গলা বেশ জ্বালা-জ্বালা করছিল। তবে এর মধ্যেই নানারকম চিন্তাভাবনা খেলে গেল মাথায়। সকাল হলে হয়তো আরও কিছু রসদ সংগ্রহ করতে পারব আমি। প্রথমেই আনতে হবে কয়েক জাগ পানীয় জল। তারপর খাবার। কোনটা আগে, কোনটা পরে — কী ভাবে কী করব, সব আমি ছকে ফেলতে লাগলাম মনে-মনে।

এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ঠান্ডায় শরীর জমে যাওয়ার ভয়টাই সব চাইতে বড়ো ভয়। তবে শীত তাড়াতে স্লিপিং-ব্যাগটা কাজ দেবে অনেকখানি। প্রয়োজনের দিক থেকে দেখতে গেলে প্রথম প্রয়োজন জলের, তারপর খাদ্যের। এই দুটি জিনিস আনার পরে আর যা-যা পারি নিয়ে আসব আমি। গ্যালি লকারে আছে দশ গ্যালন পানীয় জল। চল্লিশ থেকে আশি দিন বেঁচে থাকার মতো খাবারদাবারও আছে ওখানে। ওইসব রসদ এখান থেকে মাত্র একশো ফিট দূরে। খাদ্যবোঝাই মস্ত একটা ব্যাগও ঝোলানো আছে কেবিনের দেওয়ালে। মাসখানেকের খাবার আছে ওতে। জামাকাপড় ভর্তি বড়ো একটা ব্যাগও আছে ওখানে। সোজা কিছুটা সাঁতরে যাওয়ার পরে জলে ডুব দিলে আমার 'সারভাইভাল

www.BanglaBook.org

স্যুটটা'ও বার করে আনতে পারব। গরম কাপড়ের চমৎকার উষ্ণতার কথাও ভেবে নিলাম একবার।

ওদিকে ঢেউয়ের কোনও বিরাম নেই। একটার পরে একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল ভেলার গায়ে। ভেতরেও জল ঢুকছিল মাঝেমধ্যে। ভেলার টিউবগুলো কাঠের গুঁড়ির মতো শক্ত। কিন্তু হলে কী হবে, ভয়ংকর সব ঢেউয়ের আঘাতে নেতিয়ে পড়ছিল স্প্যাগেটির মতো। প্রচণ্ড দুলুনিতে কফির শূন্য পাত্র ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগছিল বারবার। বুঝতে পারছিলাম না ঢেউয়ের এই আঘাত কতক্ষণ পর্যন্ত সামলাতে পারবে ভেলা!

ভেলার ওপর দিকে ছোট্ট একটা আলো আছে। ওই আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ভেলার একচিলতে জগতে। আলো-আঁধারির জগৎ। দুর্ঘটনার স্মৃতি, ঢেউয়ের আঘাত আর ঝোড়ো বাতাসের হাহাকারে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমি। এর মধ্যে আবার কাল সকালে সোলোয় চড়ার ইচ্ছেটাও খেলে যাচ্ছিল মাথায়। শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে ! তবে এটা জানি, যা ঘটার তা ঘটে যাবে শিগগিরই।

৫ ফেব্রুয়রি, দিন ১

ছোট্ট ভেলায় মহাসাগরে ভাসছি। এখন আমি কেপ ভের্দ দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় ৪৫০ মাইল উত্তরে। তবে ওই দ্বীপগুলির অবস্থান হাওয়ার ঠিক বিপরীত দিকে। ভেলা ভেসে যেতে পারে, শুধুমাত্র হাওয়ার অনুকূলেই। এই হাওয়ায় ভেসে ৪৫০ মাইল যেতে পারলে মনে হয় জাহাজ-চলাচলের পথ পেয়ে যাব। নিকটতম ডাঙা সম্ভবত ক্যারিবিয়ান দ্বীপমালা, কিন্তু ওটি আছে এখান থেকে প্রায় আঠারোশো নটিকাল মাইল দূরে।

যাকগে, এখন অত হিসেবনিকেশ করে কী লাভ! সকাল হোক আগে। তবে সকাল পর্যন্ত কি টিকে থাকতে পারবে ভেলা!

হঠাৎই যেন ঝড়ের ঠিক কেন্দ্রস্থল থেকে তীব্র এক গর্জন ছিটকে উঠল আকাশে। বিকট ওই শব্দ আমার চারদিকের সব হাওয়া হয়তো শুষে নিয়েছিল। তারপরেই ঘটল বুঝি ভয়ংকর এক বিস্ফোরণ। শূন্যে লাফিয়ে উঠল ভেলা। সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেল অদ্ভুত এক উপায়ে। কিন্তু বিকট গর্জনের পরেই চতুর্দিকে নেমে এল আশ্চর্য এক প্রশান্তি। মনে হচ্ছিল জীবনের পরপারে এসে পৌঁছেছি আমি। এখন আর কোনও কষ্ট নেই আমার।

ভেলার বাইরে উঁকি মারলাম একবার। ওই তো সোলোর একটা অংশ ভেসে আছে এখনও। জলের ওপর রাডার আছড়ে পড়ছিল বারবার। কিন্তু আমার ভেলা যে ভেসে যাচ্ছে।

সোলোর বৈদ্যুতিক আলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর মাস্তুলের ওপরের ছোট্ট বাতিটি শেষ বিদায় জানাচ্ছিল আমাকে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই আলোর ওই বিন্দুটির দিকে চেয়েছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল, শুধু আমার বন্ধুকেই নয়, আমার একটা অংশকেও হারাচ্ছি আমি। দূরের সমুদ্রে ছোট্ট ওই আলোর বিন্দুটি আরও কয়েকবার ঝলসে উঠে মিলিয়ে গেল বরাবরের জন্যে।

www.BanglaBook.org

লম্বা একটা দড়ি দিয়ে সোলোর সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম এই ভেলাটাকে। সোলো এখন নেই, কিন্তু দড়ি আছে। দড়িটা আস্তে-আস্তে তুলে নিলাম ভেলায়। দড়ির ওই বন্ধনের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল আমার খাদ্য, পানীয় আর উষ্ণ পোশাকের শেষ আশা।

আস্তই আছে বোধহয় দড়িটা। শেষের ভয়ংকর ওই টানেই বুঝি আলগা হয়ে গিয়েছিল সোলোর সঙ্গে লাগানো দড়ির ফাঁস। কিংবা জলের প্রচণ্ড কাঁপুনিতে খুলে গিয়েছিল বাঁধন। এমনও হতে পারে, ফাঁস ঠিকমতো লাগাতেই পারিনি আমি।

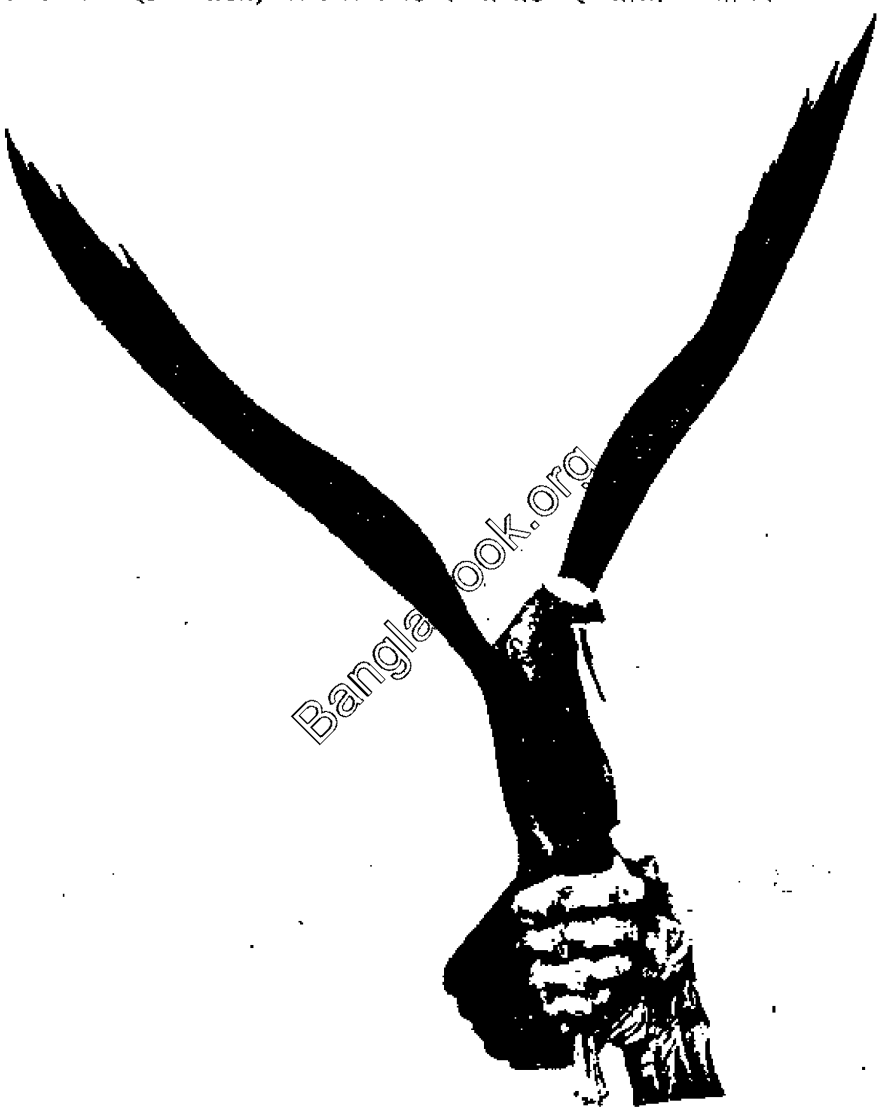

বিশ্রাম নিতে এসে আর ফেরেনি পাখিটা

যাক, এখন আর ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। বিস্ফোরণে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই বোধহয় রবারের তৈরি আমার এই ছোট্ট ঘরটি ভেসে পড়েছে সমুদ্রে। ভেলায় এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পরেই কি আমি মরব?

www.BanglaBook.org

শীতে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলাম। একটু পরে হয়তো অসহ্য কষ্ট শুরু হয়ে যাবে সারা শরীরে। নানা জায়গায় কেটেকুটে গেছে। ক্ষতগুলো আগে খেয়াল করিনি, এখন করছি। ক্ষতমুখে অসহ্য জ্বালা। এই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় বোধহয় আর নেই। মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে এখন আমি ভয়ংকর রকমের অবসাদগ্রস্ত। মনে হচ্ছিল, আমার শরীরের সমস্ত স্নায়ু সম্পূর্ণ ভাবে অনাবৃত হয়ে গেছে।

ডাইনি এবং তার অভিশাপ : খিদে ও তেষ্টা

আমি আর আমার ভেলা সারা রাত ধরে ভয়ংকর সব ঢেউয়ের আছাড় খেলাম। ইতিমধ্যে একটা কাজই শুধু করেছি, তা হল — 'সি অ্যাংকর' নামানো। নোঙর বলতে এক টুকরো কাপড়, অনেকটা প্যারাস্যুটের মতো দেখতে; থাকে জলের ওপর। বিচিত্র এই নোঙরের প্রধান কাজ হল ডুবে যাওয়ার হাত থেকে ভেলাকে বাঁচানো। ঢেউয়ের মাথা থেকে নীচে আছড়ে পড়ার সময় ভেলার আঘাতও কিছুটা সামলাতে পারে এই নোঙর।

আমার ভেলা ছ'মানুষ মডেলের স্ট্যান্ডার্ড অ্যাভন। ভেতরে আছে খাঁজ-কাটা মস্ত দুটো টিউব। একটার ওপরে আর একটা চাপানো। ভেতরের ব্যাসরেখার মাপ প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফিট।

মিনি-ট্রানস্যাট দৌড় শুরু হওয়ার আগে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন এসেছিলেন সোলোকে পরীক্ষা করতে। তখন ওঁরা বিশাল আকারের এই ভেলাটি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম : চার-মানুষের ভেলায় চেপেছেন কখনও? আমি চেপেছি। ওই ভেলায় আমার সঙ্গে ছিল আমার দুই বন্ধু। তবে যাত্রা ছিল দুর্বিষহ। পাশাপাশি থাকার বদলে একজনের জায়গা হয়েছিল আর একজনের ওপর। ওই ভেলায় বেশিদিন টিকে থাকা বোধহয় অসম্ভব! কিন্তু ছ-মানুষের এই ভেলায় দু-জন যাত্রী মাঝারি থেকে লম্বা মাপের সফর দিতে পারবে।

ওপরের টিউবের সঙ্গে জোড়া আছে অর্ধবৃত্তাকার আর-একটা টিউব। এটা ভেলার তাঁবুমার্কা ছাউনিকে খাড়া রেখেছে দিব্যি। ছাউনির ছোট্ট একটি অংশ খোলা, ওটিই হল প্রবেশপথ।

রবারের ভেলাটি খুব মজবুত। সেলাইয়ের জোড়ের ওপরেও পট্টি লাগানো আছে। ঢেউয়ের আঘাতে লাইফ-র‍্যাফ্‌ট ফেটে যাওয়ার বহু ঘটনাই জানা আছে আমার। ভেলাটি বানাবার সময় এ-ব্যাপারে আমি বেশ সজাগ ছিলাম।

টিউবে জোড় ঠিক কোথায়-কোথায়, পরিষ্কার মনে করতে পারছি। ওইসব জায়গার কোথাও ছেঁড়া-ফাটার চিহ্ন ফুটে উঠছে কি না, খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম আমি। টিউব ফোলাবার দুটি চেম্বার আছে — একটি ওপরের এবং অর্ধবৃত্তাকার ওই টিউবের, অপরটি নীচের। বাড়তি চাপ কমাবার সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌ও আছে। এসব টিউব মুখ দিয়ে ফোলানো অসম্ভব, ফোলাবার জন্যে চাই এয়ার-পাম্প।

www.BanglaBook.org

সমুদ্র এখনও ঠিক আগের মতোই উত্তাল। ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেলার পাতলা রবারের মেঝে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, প্রমাণ সাইজের দুটো ক্যাঙারু লাফালাফি করছে জলের ওপর। আমার হাঁটুর চাপে ভেলা বসে গিয়েছিল কিছুটা। ভেলা থই-থই করছে জলে। কফি-ক্যানে করে ওই জল ছেঁচে ফেলছিলাম আমি। কিন্তু প্রতিবার এক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল।

ভেলা জলশূন্য করার পরে মস্ত ঢেউ ভাঙছিল ঠিক পাশেই। তারপর প্রবল বেগে জল আবার ঢুকে পড়ছিল ভেলায়। কফি-ক্যান দিয়ে ফের জল ছেঁচতে শুরু করে দিচ্ছিলাম। জল সাফাই হওয়ার মুখে আবার ঠিক ওই ঘটনা। আমিও আবার ....। পরিশ্রমে গা একটু গরম হচ্ছিল, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই তো অসম্ভব ক্লান্তিকর। একফোঁটা বিশ্রাম নেওয়ার উপায় নেই। অবিরাম দুলুনি। নতুন ভেলার রবার, আঠা ও পাউডারের গন্ধে রীতিমতো বমি পাচ্ছিল আমার।

৫ ফেব্রুয়ারি, দিন ১

চারিদিকের কুচকুচে কালো রং ধূসর হয়ে এল শেষে। একটু একটু করে রঙিন হয়ে উঠছিল আকাশ। ভোরের সূর্য উঠছে। আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। ভয়ংকর রাতটা তা হলে পার হয়েছে। একটি দিন শুরু হওয়ার মুহূর্তকে আর কখনও এত বড়ো বলে মনে হয়নি আমার। কিন্তু ঝড়ের কোনও বিরাম নেই। খ্যাপা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল ঠিক আগের মতোই।

সমুদ্রযাত্রায় এর আগেও বেশ কয়েকবার ঝড়ের মধ্যে পড়েছি আমি, কিন্তু সেই সব ঝড়ে ডেকের নীচে এইরকম তাণ্ডব ছিল না। ওপরের ঝড় আর নীচের সমুদ্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা ভেদরেখা ছিল। কিন্তু এবার ভেতর আর বাইরের মধ্যে কোনও তফাত নেই। ডুবন্ত একটা স্পঞ্জের মধ্যে কোনওমতে বসেছিলাম আমি।

ইমার্জেন্সি পজিশন-ইন্ডিকেটিং রেডিও বিকন কি চালু করব একবার? 'এপির্‌ব'-এর বার্তা আড়াইশো মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এটি টানা বাহাত্তর ঘণ্টা পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করতে পারে। তারপর ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা কমতে থাকে আস্তে আস্তে। বেতারবার্তা পৌঁছে যায় বাণিজ্যিক বিমানেও। বাণিজ্যিক বিমান তখন উদ্ধারের জন্যে সংকেত স্থানে অনুসন্ধানী বিমান পাঠায়। কাছাকাছি এলাকার জাহাজগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয় বিপদগ্রস্ত মানুষের কথা। তেমন হলে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাব আমি।

কিন্তু এ তো নিছক অলস-কল্পনা! আমার অবস্থান ক্যানারিজের ৮০০ মাইল পশ্চিমে এবং কেপ ভের্দ দ্বীপপুঞ্জের ৪৫০ মাইল উত্তরে। ওদিকে, জাহাজ-চলাচলের নিকটতম বড়ো পথটির প্রায় ৪৫০ মাইল পুবে। দ্বীপগুলিতে বিমান চলাচল করে সম্ভবত ইউরোপ এবং আফ্রিকার পথে। এখান থেকে ক্যানারিজের দিকে কোনও বিমানকে উড়তে দেখিনি। ওদিক থেকে এসেছে কি? না, না তো। চার্ট দেখে জেনেছি, আশেপাশের ৪৫০ মাইলের মধ্যে আফ্রিকার কোনও শহরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল বিমান চলাচলের ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ, আমার এই দুর্দশার কথা কেউ জানতেও পারবে না।

www.BanglaBook.org

এপির্‌ব্‌-এর সুইচ অন করলাম ... এমনও তো হতে পারে — এতক্ষণ ধরে যা ভেবেছি, তা ভুল। কিছুকাল আগে একটা নৌকো ডুবেছিল সমুদ্রে। প্রাণ বাঁচাবার ভেলাও টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল দুর্ঘটনায়। দু-জন নাবিক শুধু ভেসেছিল উত্তাল সমুদ্রে। ওদের পরনে ছিল ভেসে-থাকার পোশাক। ভাগ্য ভালো, সঙ্গে ছিল এপির্‌ব্‌। বেতারবার্তা ছড়িয়ে পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাহায্য এসে পৌঁছেছিল।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল নাবিকরা। এই বেতারযন্ত্রটি তাহলে বোধহয় অসাধ্যসাধন করতে পারে। মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হল, তবে সামান্য সময়ের জন্য। বিচ্ছিরি একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছিল বারবার — আমার খবর কি কারও কাছে পৌঁছবে!

কী হয়েছিল সেই রবার্টসনদের? ১৯৭২ সালে তাঁদের তেতাল্লিশ ফিট লম্বা এবং উনিশ টন ওজনের স্কুনার তিমিমাছের ধাক্কায় সমুদ্রে ডুবেছিল। স্কুনারে ছিল এক পরিবারের পাঁচ সদস্য ও একজন স্কুব। পরের আটত্রিশ দিন সমুদ্রে ভেসেছিলেন তাঁরা। ভেলা টিকেছিল মাত্র সতেরো দিন। ভাগ্য ভালো, সঙ্গে ছিল নিরেট একটা ডিঙি। উদ্ধার পাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁদের আশ্রয়স্থল ছিল ছোট্ট ওই ডিঙিটাই।

বেলিদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। রবার্টসনদের মতো তাঁদের কুজারও তিমিমাছের ধাক্কায় ডোবে। কুজার ডোবার পরে ছোট্ট দুটো নৌকোয় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রশান্ত মহাসাগরে ১১৯ দিন, অর্থাৎ প্রায় চার মাস অলৌকিকভাবে ভেসে থাকার পরে উদ্ধার পেয়েছিলেন তাঁরা। এসব তো চাঙ্গা করার মতো ঘটনা, কিন্তু ...।

এপির্‌ব্‌-এর খবর কারও কানে যদি না পৌঁছয়? মহাসাগরের ওই 'জাতীয় সড়কে' জাহাজ চলাচলের সংখ্যা যদি খুব কম হয়? এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ক্যারিবিয়ানে পৌঁছতে নব্বই দিন লেগে যেতে পারে। আঠারো ডিগ্রি অক্ষরেখায় উত্তরে ভেসে গেলে সময় লাগবে একশো দিনেরও বেশি।

হিয়েরো থেকে বাবা-মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, অ্যান্টিগুয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে ১০ মার্চ হয়ে যেতে পারে। তার মানে, ওই সময়ের আগে কেউ আমার কোনও খোঁজখবর নেবে না।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় মহাসমুদ্রে মাসাধিক কাল ভেসে থাকার পরে উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা ইতিহাসে একটিমাত্রই আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুন লিমের জাহাজ টর্পেডোয় ধ্বংস হওয়ার পরে তিনি একটি নিরেট ভেলায় চেপে ১৩০ দিন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বিস্ময়কর ঘটনা। একশো-ত্রিশ দিন! যাকগে, এখন ওসব ভেবে কী হবে!

কুড়িদিন ... কুড়িদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ দেখতে পাবে আমাকে। বিমান চলাচলের পথের একটা চার্ট থাকলে বোঝা যেত এপির্‌ব্‌ কখন ব্যবহার করা উচিত। যন্ত্রটি টানা ত্রিশ ঘণ্টা চালিয়ে রাখাই ভালো। তা হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনও দৈনিক ফ্লাইটে পৌঁছে যাবে ওই সংকেত। বাকি দু'ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধানী বিমান হাজির হবে না আমার কাছে?

বেলি, পুন লিম এবং রবার্টসনরা অদ্দিন বেঁচে ছিলেন কী ভাবে? বোঝাই যায়, চারদিক থেকে নানারকম সাহায্য পেয়েছিলেন ওঁরা। সেগুলি হল — অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি,

www.BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ভাগ্য। প্রথম তিনটির ব্যাপারে আমার অবস্থা বোধহয় ওঁদের চাইতেও ভালো। ওঁরা অবশ্য বিপজ্জনক যাত্রা শুরু করেছিলেন আমার চাইতে ঢের বেশি খাবারদাবার আর পানীয় জল সঙ্গে নিয়ে। তবে, আমার কাছে আছে মাছ মারার একটা বর্শা।

ওঁরা সমুদ্রের এমন সব জায়গায় ভেসেছিলেন যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল বেশি। আমি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের এলাকায় নেই, তবে আমার সঙ্গে 'সোলার স্টিল' আছে।

ওঁদের অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ করেছে আমাকে। রবার্টসনদের কাছে আমার বাড়তি কিছু ঋণ আছে। এই ধরনের ভয়ংকর বিপদে পড়লে কী করা উচিত, সে-সম্পর্কে বই লিখেছেন দুগাল রবার্টসন। মূল্যবান ওই বইটি আমার সঙ্গে আছে। আমার দুর্ভাবনা শুধু রবারের ভেলাটিকে নিয়ে। ভেলার বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। তবে কপাল খুব ভালো হলে, ভেলা মাসখানেক টিকেও যেতে পারে।

ছেলেবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম — 'তোমার ভাগ্য তুমি বানাও।' ছবিটার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। ভালো, আমার পক্ষে যতদূর চেষ্টা করা সম্ভব ততদূরই না হয় করলাম। দায়িত্ব এড়ালাম না, দীর্ঘসূত্রী হলাম না। কিন্তু অন্তহীন এই নীল মরুভূমিতে যে বাঁচার জায়গা নেই কোথাও!

অনেক কিছুই নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকি আমি। বোকাও বানাই কাউকে-কাউকে। কিন্তু এখানে ওসব চলবে না। প্রকৃতি নির্বোধ নয়। তবে শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা ঠিক হবে না। বেলি কিংবা রবার্টসনদের মতো দক্ষতা ও মনের জোর দেখানো সত্ত্বেও মরতে পারি আমি। ওই দুটি জিনিস অনেকেরই হয়তো অনেক বেশি আছে, কিন্তু সবাই তো আর বেঁচে ফিরতে পারেনি। বীরত্বের কত গল্প শেষ পর্যন্ত শোনার আর সুযোগ পাওয়া যায় না!

এই অবস্থায় মহামূল্যবান রসদের কিছু-একটা হারাবার অর্থই হল আমার শবাধারে শেষ পেরেকটি ঠোকা। জল ছাড়া আমি বড়োজোর আর দশটা দিন বাঁচতে পারি। এয়ার-পাম্প ব্যবহার না করলে চুপসে যাবে ভেলা, আর সে-ক্ষেত্রে আমার আয়ু হবে মাত্র ঘণ্টাখানেকের। কাগজ বা প্লাস্টিকের টুকরোগুলো হারানোও ঠিক হবে না। ওগুলো না থাকলে আমার ভেলা মেরামতির কাজ আটকে যেতে পারে। এবং এর ওপরেই হয়তো নির্ভর করছে আমার বাঁচা-মরা।

ইমার্জেন্সি ব্যাগটা ভেলার দড়ির সঙ্গে খুব শক্ত করে বাঁধা। এয়ার-পাম্প এবং ওই ধরনের খুব দরকারি জিনিসগুলো আছে ব্যাগের মধ্যে। কয়েক ঘণ্টা অন্তর-অন্তর হাওয়া ভরতে হবে ভেলায়। একটু-একটু করে হাওয়া বেরিয়ে যায় ভেলা থেকে। কালো টিউব সূর্যের তাপে তেতে উঠলে হাওয়া বার হওয়ার মাত্রা বাড়ে। বাড়তি চাপ বেরিয়ে যায় ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে। ছোট্ট একটা ফুট পাম্পও আছে, কিন্তু এই ধরনের পাম্প ভেলার মধ্যে ব্যবহার করা বেশ অসুবিধাজনক। ফুট পাম্প আমি অবশ্য হাতের সাহায্যেই কাজে লাগাতাম।

www.BanglaBook.org

আমার প্রিয়, আরামপ্রদ 'ছোট্ট জাহাজ' নাপলেয়ঁ সোলোকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে এই ভেলায় উঠে আসার ঘটনাটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। হয়তো এটা দুঃস্বপ্ন! কিন্তু পিঠের ওপর এই যে জলের আঘাত, বাতাসের গর্জন, বিশাল মাপের ঢেউয়ের ভেঙে-পড়া, শৈত্য—এসব কি স্বপ্ন হতে পারে? আসলে, এমন নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি এর আগে আর কখনও হইনি!

দুঃস্বপ্নের দিনরাত

এপির্‌ব্‌ চালিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হয় না কোনও কাজ হয়েছে। নিউ ইয়র্ক-দক্ষিণ আফ্রিকা জাহাজ-চলাচলের পথে পৌঁছতে পারলে আর একবার চেষ্টা করা যাবে। বিমানপথ সাধারণত জাহাজের পথ-বরাবরই হয়ে থাকে। কিন্তু এ-পথে বিমানের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। নিউইয়র্ক-দক্ষিণ আফ্রিকা সুদীর্ঘ পথ, সরাসরি এই পথে

www.BanglaBook.org

ক'টাই বা আর বিমান ওড়ে! কিন্তু বাঁচার সুযোগ যতই কম থাকুক না কেন, জাহাজ চলাচলের ওই পথটাই এখন আমার একমাত্র ভরসা। ধরা যাক, আমার বেতারবার্তা কোনও বিমানে পৌঁছল না, কিন্তু জাহাজের চোখে তো পড়ে যেতে পারি। তবে বহু দূরের জাহাজ-চলাচলের ওই পথে পৌঁছতে পারা এবং কোনও জাহাজের চোখে পড়ার ঘটনা তো কোটিতে গুটিক!

৬ ফেব্রুয়ারি, দিন ২

প্রায়ই মনে হয়, ওই তো বিমানের শব্দ! চমকে উঠে বাইরে মুখ বাড়াই, চারদিক দেখি। না, কোথাও কোনও বিমানের চিহ্ন নেই। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ দু'কানে। আবার ঢুকে পড়ি ভেলার মধ্যে। একটু পরে আবার শুনতে পাই ওই শব্দ। মাঝেমধ্যে কী পরিষ্কার! এবার তা হলে আর ভুল হচ্ছে না। এপিরব চালু করি, বেশ কয়েক ঘণ্টা ওটা চলে; তবে কোনও কাজ হয় না। আসলে ওটা কোনও বিমানের শব্দ নয়, বাতাসের গর্জন। ভেলার টিউবের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে তীব্র গতিতে। ভৌতিক ওই কণ্ঠস্বরে [illegible]র সীমাবদ্ধতা টের পেয়ে যাচ্ছিলাম বারবার। ছোট্ট এই গুহা থেকে কিছুই তেমন নজরে পড়ছে না আমার। কতগুলো বিমান এবং জাহাজ আমাকে দেখতে না পেয়ে চলে যাবে কে জানে!

মটরশুঁটির একটা টিন কাটালাম, তারপর কিছু দানা মুখে ফেলে চিবোতে লাগলাম খুব আস্তে আস্তে। প্রতিটি দানা থেকেই আলাদাভাবে স্বাদ-গন্ধ টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমি। আজ ৬ ফেব্রুয়ারি, আমার জন্মদিন। কিন্তু এটা তো জন্মদিনের খাবার নয়। আজকের ভোজের কথাটা তো আমি একটু অন্য ভাবে ভেবেছিলাম। অন্য কথাও মনে এল। ত্রিশটা বছর তো দিব্যি কাটিয়ে দিলাম। এবার? এবার বরং আমার সমাধি-ফলকের কথাগুলো লিখে ফেলা যাক। আমার এপিটাফ লিখলাম আমি।

স্টিভেন কালাহান

৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ — ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২

স্বপ্ন দেখেছিল
ছবি এঁকেছিল
নৌকো বানিয়েছিল
মৃত্যু

মনে হল, সারা জীবন ধরে যা করেছি আমি; তা খুবই নগণ্য। এর হয়তো এক কানাকড়িও দাম নেই!

প্রচণ্ড ওই ঝড় চলল টানা তিনদিন ধরে। দিনের বেলায় সূর্যের যৎসামান্য উত্তাপ আমার এই ঠান্ডা জগতে এসে পৌঁছয়। রাত্তিরে আবার প্রচণ্ড শীত। এই অবস্থায় ঘুমনো অসম্ভব, তবে মাঝেমধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে দু-চোখের পাতা জুড়ে যেত! বিশাল-বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তো পড়ছেই। কখনও ভেলার পাশে, কখনও ভেলার গায়ে। বিকট শব্দ! ওই সব শব্দের সঙ্গে কামানের আওয়াজের বোধহয় কোনও তফাত ছিল না!

www.BanglaBook.org

এতক্ষণ একটানা নোনাজলের মধ্যে থাকার ফলে আমার গায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছিল, ফোড়াও বেরিয়েছিল একগাদা। ভেজা টি-শার্ট আর স্লিপিং ব্যাগ ওইসব ফোড়ার সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছিল দ্রুত। ফোড়া ও ক্ষতমুখে নোনাজল লাগায় যন্ত্রণারও কোনও বিরাম ছিল না।

হাত-পা টান করে শোবার পক্ষে ভেলাটা বেশ ছোটো। বিশ্রাম নিতে গেলে কাত হয়ে বেঁকেচুরে শুতে হয়। এ ভাবে শুলে অবশ্য একদিকের ঘা শুকিয়ে যেতে পারে কিছুটা।

ভেলার মেঝেয় খুব সূক্ষ্ম দুটো ফুটো দেখতে পেলাম হঠাৎ। ওই পথেই তা হলে জল চুঁইয়ে আসছে ভেলায়। কিন্তু ফুটো হল কী ভাবে? এমনও হতে পারে, সোলো ছেড়ে ভেলায় আসার পরে কোনও একসময় ছুরির ওপরে বসে পড়েছিলাম অসাবধানে।

ব্যাগে ভেলা মেরামত করার নানা জিনিসপত্তর। কিন্তু নিয়মাবলীর গোড়াতেই আছে : সারাই করার আগে ভেলাটাকে শুকিয়ে নাও ভালো করে।

এ তো বড়ো অদ্ভুত নিয়ম ! এই অবস্থায় ভেলা শুকিয়ে নেব কী করে!

যাই হোক, লেগে পড়লাম মেরামতির কাজে। আঠা, টেপ, ব্যান্ড-এড লাগানো হল। কিন্তু ভেজা রবারে আঠা ধরতে চাইছিল না। তবে থামলে চলবে না। ঘণ্টাদুয়েক টানা লেগে থাকার পরে একটা পট্টি লাগানো গেল সূক্ষ্ম ওই ফুটোদুটোর ওপর। জানি না কতক্ষণ এটা টিকবে!

জল সরে যাওয়ার ফলে ভেলা শুকিয়ে গেছে অনেকখানি। অবস্থার এই উন্নতিতে আমার মনোবল বেড়ে গেল কিছুটা। মনে হল, মৃত্যুশয্যা ছাড়তে পেরেছি। তবে মেয়াদ হয়তো খুবই অল্প সময়ের।

বিপদ থেকে বাঁচার নামমাত্র সরঞ্জাম নিয়ে বহু ক্রুজারকে সমুদ্রে ভাসতে দেখেছি আমি। এদের চাইতে আমার সরঞ্জাম ঢের বেশি। ভেলার এই ব্যাগে আছে :

ছটি টিনের পাত্রভর্তি পানীয় জল। পাত্রের ঢাকনা আছে, পরে এগুলি অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্লাইউডের দুটো ছোটো দাঁড়। এই দাঁড় বেয়ে ক্যারিবিয়ানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তবে এগুলো হাঙর তাড়াবার কাজে লেগে যেতে পারে।

হাত দিয়ে ছোড়ার মতো দুটো প্যারাসুট-বাতি। হাতে ধরে রাখার তিনটে লাল আলো এবং দুটো কমলা রঙের ধোঁয়াবাজি।

দুটো স্পঞ্জ।

ইচ্ছেমতো ভাঁজ করে রাখা যায় এমন একটা রাডার রিফ্লেকটর। এটা বসাবার কথা মাস্তুলের মাথায়। ভেলায় মাস্তুল নেই, সুতরাং এটা কোনও কাজে আসবে বলে মনে হয় না।

দুটো সোলার ডিসটিলেশন ইউনিট : সোলার স্টিল।

দুটো ক্যান-ওপেনার, ওষুধ খাওয়ার একটা ভাঙা কাপ এবং সমুদ্রপীড়া দূর করার বড়ি।

www.BanglaBook.org

ফার্স্ট-এডের বাক্স। বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো ছাড়া এই মুহূর্তে কিছুই আর শুকনো নয়।

রবারের কোলাপসিবল বেসিন।

১/৮ ইঞ্চি মোটা একশো ফিট লম্বা একটা সুতো।

সারভাইভাল চার্ট, প্রোট্রাকটর, পেনসিল ও ইরেজার।

একটা ফ্ল্যাশলাইট এবং সংকেত পাঠাবার দুটো আয়না।

ভেলা সারাবার ব্যাগ। এর মধ্যে আছে আঠা, রবারের টুকরো ও স্ক্রু-আকৃতির প্লাগ।

মাছ মারার সরঞ্জাম-ভর্তি একটা ব্যাগও আছে। সরঞ্জাম বলতে অবশ্য পঞ্চাশ ফিট সুতো ও মাঝারি মাপের একটা বঁড়শি।

এসবের সঙ্গে আছে মাথা-মোটা একটা ছুরি। ছুরিতে ভেলা যাতে ফুটো না হয়ে যায় সে-জন্যে ছুরির মাথাটা ভোঁতা। মাথায় শুধু ভোঁতা নয়, ছুরিতে ধারও তেমন নেই। এই ছুরি কিংবা বেসবল ব্যাট দিয়ে মাছের আঁশ ছাড়বার মধ্যে কোনও তফাত আছে বলে মনে হয় না।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সরঞ্জাম-ভর্তি একটা আলাদা ব্যাগ ছিল আমার, সেটাও এখন এই ভেলায়। এর মধ্যে আছে :

ছোট্ট একটা বাক্স। বাক্সে আছে পেনসিল, লেখার কাগজ, প্লাস্টিকের আয়না, ছুরি, স্টেনলেস-স্টিলের কিছু বাসনপত্র, মাছ ধরার বঁড়শি ও সুতো, রাসায়নিক আলোর দুটো স্টিক এবং রবার্টসনের 'সমুদ্রে বাঁচা' বইটা। কপাল ভালো, বাক্সের এই জিনিসপত্রগুলো ভেজেনি।

একটা কম্বল। কম্বলের ঢাকনাটা গায়ে জড়িয়ে বসে আছি। এর ফলে গা গরম হচ্ছে কিছুটা।

প্লাস্টিকের কয়েকটা ব্যাগ।

আর একটা সোলার স্টিল।

ভেলার গর্ত বোজাবার জন্যে পাইন কাঠের তৈরি কিছু প্লাগ।

আরও একশো ফিট দড়ি।

স্টেনলেস-স্টিলের তৈরি নানা ধরনের কিছু শেকল।

নানা মাপের মাছ ধরার সুতো।

এপিরব্, ইতিমধ্যেই যেটি বার করা হয়েছে।

হালকা পিস্তলের সাহায্যে সংকেত জানাবার জন্যে বারোটি লাল আলোর প্যারাসুট, তিনটে হাওয়াই বাজি। সঙ্গে আছে হাতে রেখে জ্বালাবার জন্যে কমলা রঙের ধোঁয়াবাজি, তিনটে লাল ও দুটো সাদা আলোর বাজি।

খাওয়ার জলভর্তি প্লাস্টিকের একটা জাগ।

প্লাইউডের ছোটো দুটো বোর্ড।

নৌকোর হাল সারাবার কিছু সরঞ্জাম।

ছোটো একটা বর্শা-বন্দুক।

এক ব্যাগ খাবার। খাবারের মধ্যে আছে দশ আউন্স মটরশুঁটি, ষোলো আউন্স সেঁকা বিন, দশ আউন্স কর্নড বিফ এবং দশ আউন্স ভেজানো কিশমিশ।

www.BanglaBook.org

ছোটো একটা স্ট্রোব্ লাইট।

এ-সবের বাইরেও আমার সামান্য-কিছু সংগ্রহ আছে। যেমন — একটুকরো ফোম কুশন, দেড়খানা বাঁধাকপি, স্লিপিং ব্যাগ, ছুরি ইত্যাদি।

রবার্টসনের বইটা আমার কয়েক বছর আগে কেনা। মূল্যবান বইটা যে কী কাজে লেগেছিল কী বলব ! বর্শা-বন্দুক ক্যানারিজ থেকে কিনেছি। সোলোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম ওটা, কিন্তু কয়েকবার মাথায় ঠোক্কর খাওয়ার পরে বিস্তর কায়দা করে ইমার্জেন্সি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখি। এই বর্শা-বন্দুকটাই শেষে বাঁচিয়ে রেখেছিল আমাকে।

বাঁচার লড়াই

ভেলা ভেসে চলেছিল আগের মতোই। আমি আমার শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছিলাম। সেই সঙ্গে নজর ছিল ভেলার ওপরেও। খাদ্য ও পানীয় জলের পরিমাণের ওপরেও দৃষ্টি থাকত সবসময়। যাত্রার বিবরণও লেখা শুরু করলাম। তবে রবারের ভেলায় ঢেউয়ের মাথায় বসে লেখালেখির কাজ চালানো অসম্ভব ব্যাপার। অপেক্ষা

www.BanglaBook.org

করতে হত একটু শান্ত সমুদ্রের জন্যে। ওই সময়ের মধ্যে যা পারি লিখে ফেলতাম। তারপর লেখার প্যাড খুব ভালো করে প্লাস্টিকে জড়িয়ে রেখে দিতাম ব্যাগের মধ্যে।

হিসেব কষছিলাম, ব্যাগটা যদি টিকেও যায় — আমি আর কদ্দিন টিকব! যা জল আর খাবার আছে তাতে বড়োজোর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব। অর্থাৎ, আরও চোদ্দ দিন। ওই সময় আমি হয়তো জাহাজ চলাচলের পথে গিয়ে পড়ব। কিন্তু জাহাজের কেউ কি আমাকে দেখতে পাবে! সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

ইতিমধ্যে নির্ঘাত ডিহাইড্রেশনের শিকার হব আমি। শরীরে জলের পরিমাণ খুব কমে যাওয়ার পরিণাম ভয়াবহ। ডিহাইড্রেশনে প্রথমে আমার জিভ ফুলে যাবে, তারপর সেটা কালো হতে শুরু করবে। চোখ ঢুকে যাবে কোটরের মধ্যে। শরীর বশে থাকবে না, ভুল বকতে শুরু করব, আর ঠিক তখনই হয়তো মৃত্যু এসে দাঁড়াবে আমার শিয়রে।

তীব্র এক হতাশায় ভেঙে পড়ছিলাম বারবার। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ধমকালাম নিজেকে। না, কাঁদলে চলবে না। দুর্লভ চোখের জল ফেলে বিলাসিতা করার সময় এটা নয়। ঠোঁট কামড়ে, চোখ চেপে ভেতরে-ভেতরে কিছুটা কেঁদে নিলাম আমি। কান্না নয়, চোখের জল নষ্ট করা নয়, বাঁচতে হবে — যে করেই হোক বাঁচাতে হবে নিজেকে। চারদিকে তাকালাম। অকূল সমুদ্র, কোথাও কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই।

অন্তহীন সমুদ্রে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ভাসতে-ভাসতে দিবাস্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। অসম্ভব কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে ! অতীতের ছোটোখাটো নানা দৃশ্যও ভেসে উঠছিল চোখের সামনে।

কোনওমতে এবার যদি বেঁচে যাই, ভবিষ্যৎ-জীবনটা খুব সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হবে। পরিকল্পনারও কোনও শেষ ছিল না। আবোলতাবোল ভাবার জন্যে নিজেকে ধমকালামও কয়েকবার। এখন শুধু মাথা ঠান্ডা রেখে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি একান্তই মরে যাই, অন্তিম ভালো কাজটা সেরে যাব তার আগে।

আমার এই শেষযাত্রার সুবিধে-অসুবিধের খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে রাখব। আমি মারা গেলেও বৃত্তান্ত টিকে থাকবে। এই কাহিনি আগামী দিনের কোনও নাবিককে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ হয়তো বাতলে দেবে। স্বপ্ন, ভাবনা ও পরিকল্পনা তাৎক্ষণিক মুক্তির উপায়ই শুধু জানিয়ে দেয় না; বেঁচে থাকার বড়ো একটি উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করে তোলে।

৮ ফেব্রুয়ারি, দিন ৪

৮ ফেব্রুয়ারির সকালে ঝড়ের দাপট কিছুটা কমল। কিন্তু ঢেউয়ের কোনও বিরাম ছিল না। কিছু-কিছু ঢেউয়ের মাপ আবার কম করে ফুট-পনেরো হবে। তবে ঢেউয়ের তীব্রতা ছিল না। ঢেউগুলো ভেলার ওপর আগের মতো আছড়ে পড়ছিল না বারবার।

তরল মরুভূমির দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। কোথাও কোনও মরূদ্যান নেই, পানীয় জল নেই, ছায়াঘন খেজুরগাছ নেই। শুধুই মরুভূমি।

একটুকরো আগাছা ভেসে যাচ্ছিল উত্তরের দিকে। এ কী সারগাসো! ভয়ংকর সেই সারগাসো-সমুদ্র আছে উত্তর-পশ্চিমে। কিংবদন্তি বলে, শত-শত জাহাজের কবর আছে

www.BanglaBook.org

নাকি ভয়ংকর ওই আগাছা-সমুদ্রে। ভাসমান আগাছার ওই টুকরোটা দেখে আমি আমার ভেলার গতি মাপার চেষ্টা করলাম।

নানারকম হিসেবনিকেশের শেষে মনে হল, আমি দিনে মাত্র আট মাইলের মতো যেতে পারছি। অনুকূল স্রোতের সাহায্য পেলে রোজ গড়ে সতেরো মাইল এগোতে পারব। তাই যদি হয়, তা হলে জাহাজ-চলাচলের পথে পৌঁছতে আরও দিন-বাইশ লেগে যাবে। ওহ্ ! এ তো দেখছি প্রায় অন্তহীন এক যাত্রা!

তবে যা ভেবেছিলাম আমার ভেলা তার চাইতে জোরে ছুটেছিল। দৈনিক পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল পথ পার হচ্ছিলাম। গতির উন্নতি আহামরি গোছের নয়, তবে এর ফলে মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল কিছুটা।

পানীয় জল খরচ করার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম। জল ছিল এক লিটার মাপের প্লাস্টিকের জাগে। প্রতিদিন কতটা খাচ্ছি তার হিসেব রাখতাম ছুরি দিয়ে জাগে দাগ কেটে। ঘণ্টা-ছয়েক অন্তর-অন্তর বরাদ্দ ছিল একটামাত্র ঢোঁক। এই নিয়ম বেশিক্ষণ মেনে চলা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম আমি প্রাণপণে।

ঠিক করেছিলাম, সমুদ্রের জল খাব না কিছুতেই। রবার্টসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা এককথায় জানিয়ে গেছেন, সমুদ্রের জল খাওয়ার পরিণাম মারাত্মক। এতে হয়তো সাময়িকভাবে স্বস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু জলের অধিক-মাত্রার সোডিয়াম প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ওই সঙ্গে বেরিয়ে যায় শরীরের পেশির অনেকখানি জলীয় পদার্থ। এ ভাবে কিছুদিন চলার অর্থ হল মৃত্যু।

মৃত্যু এড়াবার জন্যে প্রথমে পোলার স্টিল'টা কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম। এই বস্তুটির কাজ হল সমুদ্র থেকে পানীয় জল ছেঁকে তোলা। এইরকম আবহাওয়ায় স্টিল রোজ দুটি ছোট পাত্তর জল সংগ্রহ করতে পারবে। ওই জলে এক থেকে দু-দিনের তেষ্টা মেটানো যাবে কোনওমতে। স্টিল জলে ভাসালাম, কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারল না। তুলে নিয়ে দেখি স্টিল একেবারেই কাজ করেনি। ভীষণ দমে গেলাম আমি।

একটু বাদে দ্বিতীয় স্টিলটাকেও জলে নামালাম। ঘণ্টাখানেক পরে দেখি স্টিলের ব্যাগে আট আউন্স পরিমাণ জল জমেছে। যাক বাঁচা গেল! এবার আমি আমার জলের সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারব একটু একটু করে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ওই ব্যাগের জলে চুমুক দিয়েই থু-থু করে উঠলাম। সমুদ্রের বিচ্ছিরি নোনা জলকে পানীয় জল বানানো যায়নি!

আমার পানীয় জলের মজুত বলতে আছে ছোটো-ছোটো ছ'টি পাত্র। ওই জল খেয়ে আমি বড়োজোর আর ষোলোটা দিন বেঁচে থাকতে পারব। তারপর?

রোদ্দুরে তেজ ছিল বেশ। আমি ভেলার ঢাকনার আড়ালে সরে গেলাম। আমার প্রিয় সোলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। কী হয়েছিল সেই রাতে? দুর্ঘটনার কারণ এখনও আমার অজানা। আমার নৌকো কি কোনও ভাসমান গাছের মস্ত গুঁড়িতে ধাক্কা

www.BanglaBook.org

মেরেছিল! গুঁড়ি, না ট্রাক বয়ে নিয়ে যাওয়ার খাঁচা? কিন্তু কই, সোলোর সামনে তেমন-কিছু দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। সোলো নির্ঘাত ধাক্কা খেয়েছে পাশ থেকে। আর সে-ধাক্কা হয়তো বিশাল কোনও তিমিমাছের।

কয়েক বছর আগে আমাদের পঁয়ত্রিশ ফুটের নৌকোর সঙ্গে ফুট-চল্লিশের একটা স্পার্ম হোয়েলের ধাক্কা লেগেছিল। কপাল ভালো ছিল, 'চামড়া-জড়ানো ওই দ্বীপের' আঘাত তত জোরালো ছিল না। আমাদের নৌকোর একটা জায়গা শুধু তুবড়ে গিয়েছিল। রবার্টসন এবং বেলিরাও শিকার হয়েছিল তিমিরই।

ছ'টিমাত্র জলের পাত্র আছে। কিন্তু এইটুকু জল খেয়ে কি ষোলো দিন বেঁচে থাকা যাবে! এর মধ্যে যদি এক-আধদিন বৃষ্টি হয়, ওই জল যতটা সম্ভব ধরে রাখতে হবে। তা হলে সব মিলিয়ে হয়তো দিন-কুড়ি টিকে যাব। ভেলা না ডুবলে ওই সময়ের মধ্যে উদ্ধারের আশা কি করা যায়?

বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি জলের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে কী যেন একটা ছুটে এল! কী ওটা ? আর একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। ফুট-চারেক মাপের একটা 'সামুদ্রিক বুলেট।' হাঙরটা যে গতিতে এসেছিল মিলিয়ে গেল আবার সেই গতিতেই। একটু বাদেই আবার একটা পাখনা। কিন্তু পাখনার আড়ালের শরীরটা এবার আর হাঙরের নয়। একটা মাছ। সুন্দর নীল মাছ। আর, মাছের গোটা শরীর খাবারে ঠাসা।

ইমার্জেন্সি ব্যাগ থেকে চটপট বর্শা-বন্দুকটা বার করে নিলাম। বর্শা না বলে তির বলাই ভালো। বন্দুকের ট্রিগার টানলে ওই তির গিয়ে লাগবে মাছের গায়ে। তিরের সঙ্গে সুতো। সুতোর এক প্রান্ত বন্দুক আর ভেলার সঙ্গে বেঁধে নিলাম ভালো করে।

মাছের সংখ্যা এবার একাধিক। ডোরাডো। এক-একটা ডোরাডো লম্বায় তিন থেকে চার ফুট। ওজন বিশ থেকে তিরিশ পাউন্ডের মতো। কিন্তু এই ধরনের মাছ ধরা বেশ কঠিন, গায়ে এরা প্রচণ্ড শক্তি ধরে। ক্যানারিজের একজন নাবিক একবার আমাকে বলেছিল, একটা ডোরাডোর আঘাতে নৌকোর ককপিট ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে নষ্ট হয়েছিল স্টিয়ারিং-হুইল পেডেস্টাল।

সমুদ্র মাছেদের ডেরা, খেলার মাঠ। কী অবলীলায় সব ঘোরাফেরা করছে চোখের সামনে। কখনও একটু দূরে, কখনও খুব কাছে। কিন্তু ভেলার নিরন্তর নাচার সঙ্গে তাল রেখে লক্ষ্যবস্তুকে টিপ করতে পারছিলাম না। বন্দুক ছুড়লাম বহুবার, কিন্তু তির কখনও মাছের ধারকাছ দিয়েও গেল না। পাহাড়াপ্রমাণ ক্লান্তি আর ব্যর্থতার মধ্যে সূর্য ডুবে গেল একসময়। খিদেয় ছটফট করছিলাম বহুক্ষণ থেকেই, এখন সেই জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠল।

অসহনীয় অকথ্যার মধ্যে কেটে গেল আরও দুটো দিন। এই দু-দিনে সেই মাছের ঝাঁক আমার ভেলার কাছাকাছিই ছিল। কিন্তু একটা মাছের গায়েও তির লাগাতে পারিনি। হতাশা এবার কেমন যেন চেপে ধরেছিল আমাকে। বারবার মনে পড়ছিল আমার প্রিয় নৌকো সোলোর কথা। সোলোর লকারে কত খাবার, কত পানীয়!

www.BanglaBook.org

সোলো যদি না ডুবত! সোলোকে যদি বাঁচাতে পারতাম! লৌকিক-অলৌকিকের ভেদরেখাটুকু সরে যাচ্ছিল আমার সামনে থেকে। বিচিত্র এক কল্পনার জগতে ঢুকে পড়ছিলাম বারবার। কিন্তু না, এমন করলে চলবে না। এমন করলে বাঁচা যাবে না। বাঁচার জন্যে সচেতনতা দরকার।

বাঁচার জন্যেই সোলার স্টিল জলে ভাসালাম আবার। কিন্তু বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেও লোনা জল থেকে পানীয় জল ছেঁকে তোলা গেল না। নিরুপায় হয়ে খাবারজলের আর একটি পাত্র খুললাম। রইল বাকি পাঁচ। এই পাঁচ পাত্রে ক'টা দিনই বা বাঁচা যাবে! মাছ ধরতে পারলে শরীরে ফ্লুইডের মাত্রা কিছুটা বাড়বে, সে-ক্ষেত্রে আর পনেরোটা দিন বাঁচতে পারি। না হলে বড়ো জোর দিন-দশেক!

ভেলা শুকিয়ে যাওয়ায় রাত্রে এখন ঘুমোতে পারছিলাম কিছুক্ষণ। মাঝেমধ্যে পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছিল স্বপ্নের মধ্যে। কিন্তু তার মেয়াদ বোধহয় কয়েক মুহূর্তের বেশি নয়। উদ্ভট ওই বন্দিশালায় ঘুম ভেঙে যায় প্রতি ঘণ্টাতেই। রবারের খাঁজে চুল জড়িয়ে যায়, কিংবা ছোট্ট ওই খুপরির মধ্যে হাত-পা মেলতে গেলেই গাঁটে-গাঁটে অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে।

১০ ফেব্রুয়ারি, দিন ৬

ভেলায় আজ আমার ষষ্ঠ দিন। বাতাস বেশ জোরে বইছে, আর অতলান্তিক চালিয়ে যাচ্ছে তার 'শাফ্‌ল্'। এই শব্দটি নাবিকরা ব্যবহার করে থাকে উলটোপালটা ঢেউ ভাঙতে দেখলে।

ভেলার মেরামতি মন্দ হয়নি, কিন্তু সোলার স্টিল পানীয় জল তৈরি করতে পারেনি এখনও। স্টিলের ব্যাগে যে জল জমছে তার সঙ্গে সমুদ্রের জলের কোনও তফাত নেই। ঠিক করলাম, জমানো জল আরও কম করে খরচ করতে হবে। শুধু গলা ভেজানো, তার বেশি নয়।

অপরূপ ডোরাডো মাঝেমধ্যেই আমার খুব কাছ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল, কিন্তু মাছগুলোর চলাফেরা এত দ্রুত ছিল যে, আমার আর শিকার করা হয়ে ওঠেনি। তির একবার শুধু একটা মাছের গায়ে লেগেছিল, তবে গাঁথতে পারেনি শিকারকে।

প্রচণ্ড খিদেয় সারা শরীর অবশ হয়ে আসছিল। খিদে এখন আমার চর্বি খাচ্ছে, একটু বাদে খাবে আমার পেশীগুলো, তারপর খাবে আমার মনকে।

ঝুঁকে পড়ে নীচের সমুদ্রের দিকে তাকালাম। আরে ! মাছগুলো উধাও হয়ে গেছে কখন! মাছ নেই, আগাছা নেই। চারদিকে শুধু ঝকঝকে নীল জল। হঠাৎই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কী যেন ছুটে এল ভেলার কাছে। ওটা একটু স্থির হতেই ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। প্রাণীটা লম্বায় কম করে ফুট-দশেক হবে। চওড়া হাতুড়িধাঁচের মাথা। এত কাছে নরখাদক-হাঙর! এর দিকে ছোট্ট এই তির ছোড়া অর্থহীন।

হাঙরটা আরও কাছে এগিয়ে এল। ভয়ে আমার হাত-পা অসাড়। তবে ভাগ্য ভালো, এক ঝটকায় গোটা শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক আগের ভঙ্গিতেই গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে

www.BanglaBook.org

গেল মৃত্যুদূত। একটু ধাতস্থ হওয়ার পরে ঠিক করলাম — আর যা-খুশি করি না কেন, সমুদ্রে নেমে সাঁতার কাটা চলবে না কিছুতেই।

ঈশ্বর আছেন কি না কে জানে! আমি কি তাঁকে বিশ্বাস করি? জানি না। কোনও অতিমানবে আস্থা নেই আমার। কিন্তু অলৌকিক কোনও ঘটনাকে মেনে নিতে অসুবিধে হয় না, অস্বস্তি হয় না অধ্যাত্মজগৎকে নিয়েও। অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। শুধু এটুকু মনে হয়, আমি আছি এ-সবের মধ্যেই।

১৫ ফেব্রুয়ারি, দিন ১১

ভেলার জীবন এখন ঠিক এগারো দিনের। প্রতিটি দিনই কেটেছে নিদারুণ এক হতাশায়। ভেলার অবস্থা খারাপ নয়, কিন্তু কাল রাত্তিরে ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গেছি কোনওমতে। গায়ের সেই বিচ্ছিরি ফোড়াগুলো শুকিয়ে গেছে রোদ্দুরে। তবে খিদের কষ্ট এখন আর একদম সহ্য করতে পারছি না। আর এক উপদ্রব হয়েছে। ঘুমোলেই খাবারদাবারের স্বপ্ন দেখি।

কত খাবার! সেই সঙ্গে গাদা-গাদা আইসক্রিম! স্বপ্নে সোলো থেকেও ঘুরে এসেছি কয়েকবার। আর যতবার গেছি ততবারই খাবারদাবার জোগাড় করেছি বিস্তর। শুকনো ফল, ফলের রস, বাদাম — কী নয়!

খিদে আসলে এক ডাইনি, এর হাত থেকে বাঁচার বোধহয় কোনও উপায় নেই। ডাইনির মায়াই এত খাবারদাবার দেখিয়ে আমার খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ! ওদিকে, খুব কম-কম করে খেলেও আমার ভেলার খাবারদাবারের সংগ্রহ কমে গেছে অনেকটা।

ছোটো মাপের মাছের একটা ঝাঁক এসেও হাজির হয়েছিল। ছোটো মানে লম্বায় বড়োজোর ফুটখানেক হবে। গোল-গোল চোখ, গোল মুখ, পাখনা নাড়াচ্ছিল ঠিক যেন হাত নাড়ার ভঙ্গিতে। এগুলো নিশ্চয়ই শক্ত ছালের ট্রিগারফিশ। মাছগুলো দেখে খিদের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠল আবার। খাবার না পেলে আমি বোধহয় এবার পাগল হয়ে যাব। তখন আমার খাদ্য হবে কাগজ আর পানীয় হবে সমুদ্রের জল।

শুধু ট্রিগারফিশ নয়, ডোরাডোও ছিল। আর ছিল আমার মাছ ধরার অবিরাম চেষ্টা। দু-দুবার ধরতে ধরতে ফসকে গেলে মাছ। ক্লান্তি আর হতাশায় ভেঙে পড়েছিলাম একদম।

খিদে যদি ডাইনির নাম হয়, তার অভিশাপের নাম তেষ্টা। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার।

ঢেউয়ের আঘাতে একটা সোলার স্টিল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাকিটাকে নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিলাম। যে করেই হোক নোনা জল থেকে পানীয় জল তৈরি করতে হবে। ভাগ্য প্রসন্ন হল এবার। স্টিল কাজ করছে। পরিষ্কার, লবণহীন জল একটু-একটু করে জমতে শুরু করল স্টিলের ব্যাগে।

এগারো দিন বাদে নতুন করে একটু আশার সঞ্চার হল আমার বুকে। ভেলা যদি টিকে যায়, আর স্টিল যদি কাজ করে — আমি হয়তো আরও দিন-কুড়ি বেঁচে যাব!

www.BanglaBook.org

আরও দুটো দিন কেটে গেল। দিনের বেলায় আকাশে চড়া রোদ। ভেলার গতি এখন বোধহয় প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় চোদ্দ-পনেরো মাইল। খিদে আগের মতোই অসহ্য। মুখের মধ্যে জ্বালা-জ্বালা ভাব। স্টিল কাজ করছিল। আমি অতি কষ্টে আমার পানীয় জলের সংগ্রহ বাড়িয়ে যাচ্ছিলাম একটু-একটু করে। ভেলা যদি এই গতিতেই এগোয়, জাহাজ-চলাচলের পথে পৌঁছতে বোধহয় সপ্তাহ-দুয়েক লেগে যাবে।

ভেলায় ভাসছি তেরোদিন ধরে। এই তেরোদিনে খাবার খেয়েছি মাত্র পাউন্ড-তিনেক। পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে। সব সময়ই ধুঁকছি। শরীরের চর্বি উধাও। এখন ক্ষয় হচ্ছে মাংস-পেশি। দুঃসহ এই অবস্থার মধ্যে খাবারের স্বপ্ন হঠাৎ-হঠাৎ ঠিক চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছিল আমার ওপর।

একটু বাদে ট্রিগারফিশের ঝাঁক আবার আমার ভেলার কাছে ভাসতে শুরু করে দিল। বর্শা-বন্দুক হাতে তুলে তাক করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ট্রিগার টানতেই — অবিশ্বাস্য ঠেকছিল গোটা ব্যাপারটা, একটা মাছ গেঁথে ফেলেছি আমি। মাছটা টেনে তুললাম ভেলায়। মাছের গোল-গোল চোখ দুটো ঘুরছিল, গোল মুখে তীক্ষ্ণ শব্দ। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে নিজের মনে বলে উঠলাম,"খাবার, খাবার পেয়েছি আমি!"

ফ্লের-গান দিয়ে মেরে কবজা করার চেষ্টা করছিলাম মাছটাকে। অসম্ভব শক্ত ছালের মাছ। মনে হচ্ছিল, কংক্রিটের ওপর লাঠি চালাচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ ছুরি চালাবার পরে ছুরি গাঁথল মাছের গায়ে। মাছের গোল চোখদুটো কেমন যেন ঝলসে উঠল মুহূর্তের জন্য, পাখনা নড়ল দ্রুতগতিতে; তারপর মাছটা মরল। আমার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। আমি মাছের জন্য কাঁদলাম, নিজের অসহনীয় নৈরাশ্যের কথা ভেবে কাঁদলাম। তারপর যাচ্ছেতাই তেতো ওই মাছের টুকরোগুলো এক-এক করে গুঁজে দিলাম মুখের মধ্যে।

১৭ ফেব্রুয়ারি, দিন ১৩

ট্রিগারফিশের সঙ্গে গণ্ডারের চেহারার বেশ মিল আছে। মাছের পিঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে মোটা একটা কাঁটা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছুরি চালাবার পরে মাছের শক্ত চামড়া ভেদ করতে পেরেছিলাম কোনওমতে।

তারপর কাটা মাছে মুখ গুঁজে খয়েরি রক্ত চুষে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। তেতো রক্তে গা গুলিয়ে উঠেছিল। মুখের রক্তটুকু ফেলে দিয়েছিলাম থু-থু করে।

একটু বাদে সামান্য ইতস্তত করে মাছের একটা চোখ খুবলে নিয়ে মুখে পুরলাম, তারপর দাঁতের চাপে পিষে ফেললাম ওটাকে। ওহ্! জঘন্য! বমি পেয়ে গেল। হাঙর পর্যন্ত কেন এই জাতের মাছকে ছুঁতে চায় না —বোঝা গেল এবার।

তবে ট্রিগারফিশটার সবটাই অখাদ্য নয়, খুঁজেপেতে কিছু ভালো অংশও পাওয়া গিয়েছিল। লিভারের স্বাদ তো বেশ মিষ্টিই।

সমুদ্র শান্ত, তবে আকাশে বেশ মেঘ ছিল। ধূসর আকাশের ছায়া পড়েছিল সমুদ্রে। আগের দিনের আকাশে ঝলমলে সূর্য ছিল, ওই সূর্যের সুবাদে সোলার স্টিলের ব্যাগে কুড়ি আউন্সের মতো পানীয় জল জমা পড়েছে।

www.BanglaBook.org

ভেলা ঠিক আগের ভঙ্গিতেই ভেসে চলেছিল সমুদ্রে। এমনিতে কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না, তবে রবারের ভেলার নীচে মস্ত সব মাছের প্রচণ্ড গুঁতোয় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। ভেলার নীচে নিশ্চয়ই বিস্তর শামুক, গুগলি জন্মেছে, সে-সব খাওয়ার জন্যেই মাছেদের এই অবিরাম আক্রমণ। মাছ বলতে ডোরাডো। ডোরাডোগুলোর আক্রমণের পদ্ধতির সঙ্গে বক্সিং প্যাটার্নের বেশ মিল আছে। মস্ত গোল ঝাঁক ছোটো হতে-হতে হঠাৎই বিদ্যুৎগতিতে হানা।

মাছগুলোর দিক তাক করে বর্শা-বন্দুক ছুড়ে-ছুড়ে আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বর্শা একদিকে, মাছ আর-একদিকে। ভেলায় কাত হয়ে বসে এবার তাক করলাম অনেকক্ষণ ধরে। মাছগুলো কী সহজ ভঙ্গিতে সাঁতরে আসছে এদিকে। আসতে-আসতে কাছে এসে যেন থেমে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছুড়লাম আমি।

অভাবিত কাণ্ড ! শুধু আমি নয়, মাছটাও বোধহয় চমকে গিয়েছিল। ছোট্ট বর্শা গেঁথে গেছে মাছের গায়ে। তারপর শুরু হল আর এক লড়াই। ভেলা, সমুদ্র উথালপাথাল। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত আমিই জিতলাম। অতি কষ্টে বিশাল মাছটাকে টেনে তুললাম ভেলায়।

ভেলায় উঠে পেল্লায় সব আছাড় খেতে লাগল মাছটা। যে কোনও মুহূর্তে ভয়ংকর একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। মাছের গায়ে ধারালো বর্শা। ওই বর্শা ভেলায় একবার গেঁথে গেলে আর কিছু দেখতে হবে না ...।

আট ইঞ্চি পুরু প্লাইউডের চৌকো একটা টুকরো ছিল ভেলায়, সেই কাঠটার ওপর মাছটাকে ফেলে বেধড়ক ছুরি চালাতে লাগলাম আমি। বইতে পড়েছি, মাছের চোখ চেপে ধরলে অবশ হয়ে আসে মাছ। আমি হাতের ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করলাম মাছের চোখে। না, সহানুভূতি জানাবার সময় এটা নয়। আস্তে-আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল প্রকাণ্ড মাছটা।

এবার ধীরেসুস্থে মাছ কাটতে বসে গেলাম আমি। এক ইঞ্চি চওড়া আর ইঞ্চি-ছয়েক লম্বা টুকরো বার করলাম অনেকগুলো। তারপর টুকরোগুলো সুতোয় গেঁথে শুকোতে দিলাম রোদ্দুরে।

সন্ধের মুখে মাছের মাথা, কাঁটা ইত্যাদি টান মেরে অনেকটা দূরে ফেলে দিয়ে রক্তমাখা স্পঞ্জগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধুয়ে নিলাম সমুদ্রের জলে। রক্তের একটিমাত্র বিন্দু বহু দূরের হাঙরকে মুহূর্তের মধ্যে কাছে টেনে আনতে পারে। সুতরাং সাবধান!

লক্ষ করেছিলাম, এই ধরনের মাছগুলো জোড়ায় জোড়ায় ঘোরাফেরা করে। একটাকে ধরায় আর একটা কেমন যেন একলা হয়ে গিয়েছিল। তারপর ওই নিঃসঙ্গ মাছটা শোধ তোলার ভঙ্গিতে আমার ভেলায় ধাক্কা মেরেছিল বহুক্ষণ ধরে।

রাতের দিকে ভেলার সঙ্গে যাচ্ছিল গোটা-তিরিশেক মাছ। প্রায় সারা রাত ধরে ভেলার গায়ে মাছগুলোর সে কী আঘাত! এ যেন এক উন্মত্ত জনতা, বাগে পেলেই ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে। শব্দহীন কিছু কথা অদ্ভুত উপায়ে ভেসে আসছিল আমার কানে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম : "এই যে মানুষ, খুন করার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৮ ফেব্রুয়ারি, দিন ১৪

সকালে মাছের ওই টুকরোগুলোর স্বাদ বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ। বাহ্! দিব্যি লাগছে তো খেতে! শুকনো মাছের সঙ্গে একটু লেবু আর রসুন হলে দারুণ হত! ক্ষুধার্ত মানুষের পক্ষে হাতের খাবার না খেয়ে রেখে দেওয়া কঠিন। কিন্তু রাখা দরকার, আবার কবে মাছ ধরতে পারব কে জানে!

লোকালয় থেকে হাজারখানেক মাইল দূরে আমি। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত জীবন, সঙ্গীসাথী নেই, তবে সঙ্গে আছে অমূল্য এক সম্পদ। পনেরো পাউন্ডের মতো কাঁচা মাছ শুকোচ্ছে ভেলার এক প্রান্তে। ওই প্রান্তটির নাম দিয়েছি আমি — কসাইখানা।

সোলার স্টিলের ব্যাগে খাওয়ার জলের পরিমাণও বাড়ছে একটু-একটু করে। উপস্থিত খিদেতেষ্টার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। যা খাবারদাবার আছে তাতে আরও দিন-দশেক চলে যাবে দিব্যি। আশা করি এই সময়ের মধ্যে আমি জাহাজ চলাচলের পথে পৌঁছে যাব। পথটি এখান থেকে প্রায় সওয়া-দুশো মাইল দূরে। এ-ক'টা দিন তা হলে আর শিকারটিকার নয়। হাঁটু ছড়ে গেছে বিচ্ছিরিভাবে, টানা বিশ্রামে ওই ক্ষত শুকিয়ে নেওয়া যাক আগে।

অন্তহীন সমুদ্রে ভেসে চলেছিল ভেলা। মাঝেমধ্যেই আমার কেমন যেন বিভ্রম তৈরি হচ্ছিল! আমি বোধহয় একইসঙ্গে সত্য ও মায়ার মধ্যে। একইসঙ্গে কয়েকটি জগৎ যেন ধরে রেখেছে আমাকে। এরমধ্যে আছে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। লৌকিক আর অলৌকিকও মিশে যাচ্ছিল আশ্চর্য উপায়ে। বিভ্রম কেটে গেলেই ভয়ংকর এই বর্তমান সম্পর্কে নিজেকে সজাগ রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম আমি।

ভেলার ঠিক পাশেই ডোরাডোর শব্দ। কখন যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম আবার, মাছের ঘাইতে সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। অভ্যাসবশে হাতে বন্দুক নিয়ে ভেলার বাইরে উঁকি মারলাম। না, কাছাকাছি মাছের কোনও চিহ্ন নেই। চারদিকে অকূল সমুদ্রের শান্ত বিস্তার। হঠাৎই অন্ধকার দিগন্তরেখায় ভেসে উঠল একটা জাহাজ।

জাহাজটা বোধহয় মাইল-চারেক দূর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। আমি চটপট ফ্লেয়ার আর বন্দুক তুলে নিলাম। সংকেত পাঠাতে হবে জাহাজের উদ্দেশে। ভেলা থেকে হাওয়াই বাজি ছিটকে উঠল আকাশে। কমলা রঙের উজ্জ্বল আলো। আলোয় আলো হয়ে গেল আকাশ। তারপর ওই বাজি থেকে ঝলমলে একটা প্যারাস্যুট বেরিয়ে এসে ভাসতে লাগল আকাশে।

জাহাজের আলো এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। মনের আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি - আমাকে ওরা দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই। দু-নম্বর বাজি ছুড়লাম আকাশে। দুর্বল পা-দুটো নেচে উঠল। জাহাজ আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। আর কোনও বিপদ নেই, হাঙরের ভয় নেই। পানীয় জলের সংগ্রহ থেকে বেশ কিছুটা জল খেয়ে ফেললাম মনের আনন্দে।

কুয়াশার হালকা একটা আস্তরণ নেমে এসেছিল আকাশ থেকে। আমার কিছুটা দক্ষিণ দিক দিয়ে এগিয়ে আসছে জাহাজটা। আর একটু পরেই উদ্ধার করা হবে আমাকে। তীব্র

www.BanglaBook.org

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেহে। সুদীর্ঘ চোদ্দদিন বাদে উদ্ধার পাচ্ছি তা হলে! তৃতীয় বাজিটা শূন্যে ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম : আমি এখানে।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল পরিষ্কার।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম ছুঁচলো-দাড়ি ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করছেন, "কোথায় যাবেন আপনি?"

বললাম, "উপস্থিত আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই।"

"ভালো বলেছেন। আমরা এর পরে থামছি জিব্রালটরে।"

মাছের টুকরোর মালাটা আমি উপহার দিলাম ক্যাপ্টেনকে।

স্বপ্নটা দেখে নেওয়ার পরেই একটা হাতবাজি ধরালাম। উজ্জ্বল আলো। ওই আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠেছিল আশপাশের সবকিছু। জাহাজটি এখন মাত্র মাইলখানেক দূরে। ওরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে আমাকে।

আরও কিছুটা এগিয়ে এসেছে জাহাজ। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল এক জাহাজ। জাহাজের আলোকিত কেবিন দেখতে পাচ্ছিলাম। জাহাজের শব্দও শোনা যাচ্ছিল অল্পস্বল্প। আর একটা হাতবাজি ধরালাম। আমার চারদিক আবার আলোয় আলো হয়ে গেছে। জাহাজের লোকজন নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে আমাকে !

বাতাসে ডিজেলের খুব হালকা গন্ধ। তার মানে আরও কাছে এসে গেছে জাহাজ। কিন্তু হঠাৎই ঘটে গেল মস্ত অঘটন। জাহাজটা চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। আতঙ্কিত হয়ে আর একটা প্যারাসুট ফ্লেয়ার ছুড়লাম আকাশে। তারপরেই অসাড় হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। জাহাজের কেউই দেখতে পায়নি আমাকে।

রামবোকার মতো কাজ করে বসেছি আমি। তাড়াহুড়ো করে ছ'ছটা বাজি নষ্ট করার কোনও মানে হয়! দুর্লভ পানীয় জলেরও অনেকটা নষ্ট করে ফেলেছি। জাহাজের ওপর এতখানি নির্ভর করা উচিত হয়নি আমার। বেলিরা তো শেষ পর্যন্ত আট নম্বর জাহাজের চোখে পড়েছিল।

নিজের ওপর রাগ হয়ে গেল ভীষণ। কেন আমি স্বপ্ন আর সত্যকে মিশিয়ে ফেলেছিলাম একসঙ্গে!

১৯ ফেব্রুয়ারি, দিন ১৫

ভয়ংকর এক অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটতে লাগল আবার। কী হবে জানি না! যে-কোনও মুহূর্তে হাঙরের আক্রমণের মুখে পড়তে পারি। আক্রান্ত হওয়ার আগে কেউ কি আমাকে উদ্ধার করতে আসবে?

আশার বোধহয় কোনও শেষ নেই। মারাত্মক একটা ঘা খাওয়ার পরেও স্বপ্ন দেখছি আমি। তবে জোর করে এই মায়া থেকে সত্যের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হাঙর আবার আসবে এবং সেই হাঙরের সঙ্গে লড়াইও করতে হবে আমাকে।

বেঁচে থাকার লড়াইটা বড়ো অদ্ভুত। এই বেঁচে থাকার জন্যেই বারবার কঠিন সব সিদ্ধান্তের সামনে পড়তে হচ্ছিল আমাকে। মাছ মারতে গিয়ে প্রতিবারই মস্ত এক ঝুঁকি

www.BanglaBook.org

নিচ্ছিলাম আমি। বর্শা-বন্দুকটা নষ্ট হতে পারে। তার চেয়েও বড়ো কথা, ওই বর্শার খোঁচায় ফেঁসে যেতে পারে রবারের ভেলা। তখন কেউ না বাঁচালে মৃত্যু অবধারিত।

শিকার না করার বিপদও কম নয়। মাছ মারা ছেড়ে দিলে মজুত খাদ্যের পুঁজি ফুরিয়ে যাবে দ্রুত। তখন মৃত্যু হবে অনাহারে। এই অবস্থায় আমার সিদ্ধান্তগুলো ঠিক শাঁখের করাতের মতো, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। শেষ পর্যন্ত পুরোটাই যেন জুয়োখেলা।

সব মিলিয়ে দশটা ডোরাডো ধরেছি। প্রথম ডোরাডোর কয়েকটা টুকরো এখনও আমার ভেলার কসাইখানায় ঝুলছে। এখন আমার বেঁচে থাকার জন্যে যতটুকু মাছের দরকার, ততটুকু পেলেই খুশি। অকারণে মাছ মারতে চাই না আমি।

২১ ফেব্রুয়ারি, দিন ১৭

অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল একটু-একটু করে। গত দিন-চারেক ধরে ভেলার ধারেকাছে হাঙর আর দেখা যায়নি। সকাল-সন্ধ্যায় ভেলার গায়ে ডোরাডোর গোঁত্তাও বোধহয় তেমন জোরদার ছিল না। কাল একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, আর বৃষ্টি নামতেই ঠিক ছেলেমানুষের মতো আকাশের দিকে মুখ হাঁ করে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। বৃষ্টির জল ধরায় আমার পানীয় জলের পরিমাণ আউন্স-ছয়েক বেড়ে গিয়েছিল।

গোড়ার দিকের সেই অসহ্য খিদে এখন আর নেই, তবে অর্ধাহারে শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। শরীর জানে, শরীরের কী প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাবার উদ্ভট একটা চেষ্টা চলত স্বপ্নের মধ্যে। আইসক্রিমের স্বপ্ন দেখতাম আমি। স্বপ্ন দেখতাম সেঁকা রুটি, ফল আর সবজির। স্বপ্নের ওই সব খাবার দেখে স্বপ্নের মানুষটার জল গড়াত জিভে। তবে বাস্তবের জীর্ণ-শীর্ণ মানুষটার জিভ আর আগের মতো লালা তৈরি করতে পারত না। প্রতিদিনই খাবারদাবারের স্বপ্ন দেখতাম আমি।

হঠাৎ দেখি একটা জাহাজ ! না, স্বপ্ন নয় — সত্যি। আগে দেখতে পাইনি, হঠাৎই যেন খুব কাছে এসে গেছে। মালবাহী জাহাজ, খোলের দিকে লাল রং করা। জাহাজের লোকজন নিশ্চয়ই এই ভেলাটাকে দেখতে পেয়েছে। ওরা এখন তা হলে উদ্ধার করতে আসছে আমাকে। আমার অস্তিত্বের কথা আরও ভালো ভাবে জানান দেওয়ার জন্যে শূন্যে একটা বাজি ছুড়লাম আমি।

জাহাজ আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। আমি ঠায় তাকিয়েছিলাম ওদিকে। কেউ-না-কেউ আমাকে দেখতে পেয়েছে নির্ঘাত। তবে জাহাজের ডেকে কেউ নেই। থাকলে তার পোশাক-আশাকের নিখুঁত বর্ণনা পর্যন্ত আমি দিয়ে দিতে পারতাম। না পারার কোনও কারণ নেই — এত কাছে এগিয়ে এসেছে জাহাজ! কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আর একটা বাজি ধরালাম আমি। কমলা রঙের আলো আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। না, তবু কারও দেখা পাওয়া গেল না। নানা ভাবে অদৃশ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করার পরে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি : এই যে, আমি এখানে। দেখতে পাচ্ছ না!

www.BanglaBook.org

জাহাজের শব্দে চাপা পড়ে গেল আমার গলা। তবু আমি থামলাম না। অবিরাম চিৎকারে গলা চিরে গেল আমার। না, জাহাজের কেউই দেখতে পায়নি আমাকে। কাছের জাহাজ দূরে চলে গেল দ্রুত। তারপর মিনিট-কুড়ির মধ্যে ধীরে-ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল জাহাজটা।

এই ভেলায় চেপে আর কোনও জাহাজের এত কাছে কি আর আসতে পারব? সম্ভবত না। তা ছাড়া, আধুনিক জাহাজের কে-ই বা আর সর্বক্ষণ চোখ রাখতে যাচ্ছে সমুদ্রে! যেখানে খুব বেশি জাহাজ চলাচল করে সেখানে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে একটু বেশি নজর রাখা হয়। অন্যত্র নয়। এখানকার মতো জাহাজহীন সমুদ্রে কার দায় পড়েছে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকার! ক্যাপ্টেনের নির্দেশে কোনও ক্রু হয়তো মাঝেমধ্যে নজর ঘুরিয়ে নিচ্ছে দিগন্তরেখায়। ব্যস, ওই পর্যন্তই। কিংবা চোখ বুঝি শুধুই রাডারে।

দিগন্তের যে-জায়গায় জাহাজটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, ঠিক সেখানকার আকাশে ধোঁয়ার একটা হালকা স্তর ভাসছিল। যুক্তিবুদ্ধির আলোয় ঘটনাটাকে দেখার চেষ্টা করছিলাম আমি, কিন্তু পারছিলাম না। থেকে থেকেই আক্রান্ত হচ্ছিলাম তীব্র এক হতাশায়। রাগ হচ্ছিল না, তবে সমুদ্রতীরের উষ্ণ জীবনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছিলাম মাঝেমধ্যে।

'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'-র কিছু-কিছু কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। 'যদি শুধু ওই ছেলেটা এখানে থাকত ... শুধু ওই ছেলেটা।' একটু বিশ্রামের বড়ো প্রয়োজন আমার। আর চাই একজোড়া চোখ, চাই দ্বিতীয় কোনও কণ্ঠের সাহচর্য। কিন্তু ভেবে দেখলাম, কোনও সঙ্গী থাকলে আমার এই অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না, বরং খাওয়ার জলে টান পড়ে যাবে।

অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনার কোনও শেষ ছিল না। এক ভাবনার শেষে আর-এক ভাবনা। এতদিন পর্যন্ত আমার এই ভেলাটাকে 'ভেলা' ছাড়া আর কিছুই বলিনি। হঠাৎ মনে হল, এর একটা নাম দিলে কেমন হয়! একসময় আমার এই ধরনের দুটো ডিঙি ছিল। আমি মজা করে সে দুটোর নাম রেখেছিলাম, 'রবার ডাকি ১' আর 'রবার ডাকি ২'। নামকরণের ওই ধারাটা বজায় রাখলে মন্দ হয় না। আমি আমার এই ভেলার নাম রাখলাম 'রবার ডাকি ৩'।

খাবারের রসদ বাড়াবার চেষ্টায় লেগে গেলাম আবার। বহুবার ব্যর্থ হওয়ার পর একটা ট্রিগারফিশ ধরলাম শেষে। মাছটা ছিল ডিমে ভর্তি। কী মিষ্টি ডিম ! ডিম খেয়ে শরীর বোধহয় চাঙ্গা হল কিছুটা।

অনেক দূরে আর একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। তৃতীয় জাহাজ। বাজি ছুঁড়লাম আকাশে। কিন্তু কোনও কাজে এল না। জাহাজ দিগন্তে মিলিয়ে গেল ধীরে-ধীরে।

সংকেত পাঠাবার বাজির সংখ্যা কমে এসেছে বেশ। তবে জাহাজ চলাচলের পথের কাছে এসে গিয়েছি বোধহয়। তৃতীয় জাহাজটাও আমাকে দেখতে না পেয়ে চলে গেছে। হয়তো চতুর্থবারেই কপাল খুলবে আমার।

www.BanglaBook.org

২৬ ফেব্রুয়ারি, দিন ২২

আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ভেলায় আমার বাইশ দিনের জীবন। ভালোই চলছে ভেলা। চারদিক ঝকঝক করছে রোদ্দুরে। আমার সামনে এখন সদ্য-ধরা একটা ডোরাডো। মাছ কাটাকুটির ব্যাপারে আমি এখন বেশ পোক্ত। মাছের কিছুই তেমন নষ্ট করি না। হৃৎপিণ্ড ও যকৃতও খাই। চোখের জলীয় পদার্থ চুষে নিই। মেরুদণ্ড ভাঙি, তারপর ভার্টিব্রার রসটুকুও খেয়ে নিই।

প্রতিদিন পানীয় জল খাই নির্দিষ্ট মাপে। আধবোতলটাক জল। ওইটুকু জলেই তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা করি। কঠিন এই নিয়ম মেনে চলার ফলে আমার খাওয়ার জলের সংগ্রহ বেড়ে গেছে কিছুটা। এমনিতে ভালোই আছি। তবে আমার সত্যিকারের ভালো-মন্দ থাকা নির্ভর করছে সমুদ্রের চেহারার ওপর। সমুদ্র ফুঁসে উঠলে, বড়ো-বড়ো ঢেউ ভাঙলে, চুপসে যাই একদম।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যের তাপও বেশ বেড়ে উঠেছিল। জ্বালা ধরেছে সর্বাঙ্গে। অস্বস্তিও হচ্ছিল ভীষণ। মাথা ঘুরে পড়ে যাব নাকি! চোখের সামনের সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আন্দাজে কফি-ক্যানে কিছুটা জল তুলে নিয়ে মাথায় ঢাললাম। তারপরেই আমার যেন জ্ঞান হারাবার দশা হল।

হঠাৎই বিশাল একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ভেলার ওপর। প্রচুর জল ঢুকে গিয়েছিল ভেলায়। ভেলার একটা প্রান্ত জলের মধ্যে। আমি কি তা হলে ডুবছি! না, ডুবলাম না। খ্যাপা ঢেউ ভেলা আর আমাকে ওলটপালট করে দিয়ে মিলিয়ে গেল ওদিকে।

আস্তে-আস্তে কিছুটা সামলে উঠলাম আবার। নিজেকে সজাগ, সতর্ক রাখার চেষ্টা করছিলাম সব সময়। এখন বেঁচে থাকার জন্যে তিনটে জিনিস খুব জরুরি—খাদ্য, পানীয় আর ভেসে থাকার ভেলা। তবে মাঝেমধ্যে অন্যরকমের চিন্তাভাবনাও খেলে যাচ্ছিল মাথায়। মনে হচ্ছিল—আমি আর বর্তমান নই, অতীত। আমার সব কিছুই অতীতকালের। এখন যা ঘটছে, তা মরে যাওয়ার পরের ঘটনা। এ সবের আর কোনও বিনাশ নেই।

কিন্তু এই দর্শন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল না। আসন ছেড়ে উঠে পড়ছিলাম প্রায়ই, কনকনে শীতের বাতাসকে অগ্রাহ্য করার কোনও উপায় নেই। চারদিকে নজরও রাখছিলাম পুরোমাত্রায়। একটা জাহাজকেও হারাতে চাই না আমি।

সোলার স্টিলে ছোট্ট একটা ফুটো চোখে পড়ল। ফিতেটিতে জড়িয়ে ফুটো বন্ধ করলাম। যাক, কাজ চালাবার মতো হয়েছে আবার। পানীয় জল তৈরি হচ্ছে আগের মতোই। তবে আমার সাবধান হওয়ায় কিচ্ছু এসে যায় না। উলটোপালটা হাওয়া বইছিল। আর একটা ভয়ংকর ঝড়ের আশঙ্কা আস্তে-আস্তে চেপে ধরল আমাকে।

২৭ ফেব্রুয়ারি, দিন ২৩

সকালের বাতাসে তীব্র শিসের শব্দ উঠতে লাগল। সমুদ্র উত্তাল। এক-একটা ঢেউয়ের মাপ কম করে ফুট-দশেক হবে। ওইসব ঢেউয়ের মাথায় উঠছিল আমার ভেলা, তারপর আছড়ে পড়ছিল নীচে।

www.BanglaBook.org

এই অবস্থায় কোনওদিকে নজর রাখা অসম্ভব, কিন্তু আমি এই অসম্ভব কাজটাই সম্ভব করার চেষ্টা করছিলাম। ভেলা ঢেউয়ের মাথায় উঠলে হাঁটুতে ভর দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিলাম। কয়েক মুহূর্তের দেখা। তারপরেই প্রকাণ্ড ঢেউ আর ঢেউয়ের ফেনা ঢেকে দিচ্ছিল দূরের সব কিছু। এই ভাবেই একবার দেখলাম দিগন্তরেখায় —। কিন্তু নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। শেষে আবার একটা বিশাল ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল আমার ভেলা। হ্যাঁ, ওই তো! ওই তো একটা জাহাজ। জাহাজ চলেছে উত্তর দিকে।

জাহাজটা বহু দূরে। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আকাশে বাজি ছোড়া এখন অর্থহীন। উদ্ধার পাওয়ার কোনও আশাই নেই। কিন্তু জাহাজ উত্তরমুখো যাচ্ছে দেখে খুশিতে নেচে উঠল আমার মন। উত্তর দিক — তার মানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিউ ইয়র্ক। চব্বিশ দিন আগে যা নেহাতই একটা স্বপ্ন ছিল, আজ তা সত্য হয়ে উঠেছে। জাহাজ-চলাচলের পথে পৌঁছে গিয়েছি আমি, এবং এখনও বেঁচে আছি!

কল্পিত এক জগতে

শক্ত এবং ঠান্ডা ধাতু। ঘণ্টাখানেক বুলওয়ার্কের ওপর ঝুঁকে থাকার ফলে আমার কনুই দুটোয় অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন আমার জন্যে পশমের যে-কোটটা নিয়ে এসেছিলেন সেটা এবার খামচে ধরলাম আমি। ক্যাপ্টেন আমার দিকে রহস্যময় ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললেন, "আর কখনও এই শহরটা দেখতে পাবেন, ভাবতে পেরেছিলেন আপনি? আমি বাজি ধরে বলতে পারি — পারেননি।"

দিগন্তের দিকে তাকালাম আমি। না, দিগন্ত আর আগের মতো শূন্য নয়। ওখানে মনোলিথিক স্কাইস্ক্র্যাপারের সারি। বহুতল ওইসব বাড়ির সামনে ধোঁয়াশা। কাছের ওই শহরের শব্দ মাঝেমধ্যে জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। না, নিউ ইয়র্ক আমি যে আবার ইহজন্মে দেখতে পাব— এ সত্যিই ভাবতে পারিনি!

কিন্তু হঠাৎই চারপাশের সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল আবার। অন্ধকারের মধ্যে তীব্র গর্জন। মাথায় যেন শক্ত একটা লাঠির বাড়ি পড়ল। শুধু শক্তই নয়, ঠান্ডা এবং ভেজা-ভেজা। আক্রমণকারীর গর্জনের কোনও শেষ ছিল না। আঘাত খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আছড়ে পড়েছিলাম আমি।

প্রকৃত সত্য হল এই যে, আমি এখনও আগের সেই অন্ধকার পৃথিবীতে। বহু দূরে নিউ ইয়র্ক। প্রবল ঝড়ে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল আবার। বিশাল-বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে ক্রমাগত আছাড় খাচ্ছিল রবার ডাকি।

প্রতি রাতেই বিচিত্র এক স্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়তাম আমি। ওই জগতে সুন্দর, নরম পোশাক থাকত আমার গায়ে। খাবারের সুগন্ধে ম-ম করত চারদিক। স্বপ্নের ওই অসাধারণ জগতে আমার সচেতন মন মাঝেমধ্যে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠত, "যতটা

www.BanglaBook.org

পারো উপভোগ করে নাও, চটপট — এক্ষুনি আবার ঘুম ভেঙে যাবে তোমার।" আমি আমার মনের এই দু'রকম অবস্থার সঙ্গেই বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম।

আমার জীবনে এখন বেশ কয়েকটি মাত্রা। একদিকে আছে দিবাস্বপ্ন, রাতের স্বপ্ন, অপরদিকে অন্তহীন শারীরিক শ্রম।

বাস করার উপযোগী নতুন একটি জগৎ নির্মাণে আমার চেষ্টার কোনও অন্ত ছিল না। বাঁচার এই নাটকে প্রধান ভূমিকাটাই চাই আমি। নাট্যরূপটি তো আপাতদৃষ্টিতে বেশ সহজ-সরল বলেই মনে হচ্ছে। টিকে থাকো, পরিমাপমতো খাদ্য ও জলের ব্যবহার করো, মাছ ধরো, আর সামলে রাখো পানীয় জল তৈরির সোলার স্টিল। এই হচ্ছে নাটক।

মাছ ধরার কাজটা সত্যিই খুব কঠিন। বহুক্ষণ ধরে তাক করে করে বন্দুক ছোড়া, কিন্তু শিকার বিদ্যুৎগতিতে আগের জায়গা থেকে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচায়।

বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পরে এইমাত্র একটা ডোরাডোকে গেঁথেছি। বর্শা ঢুকেছে মাছের লেজের দিকে। কিন্তু মাছটাকে বাগ মানিয়ে ভেলায় তুলতে পারছিলাম না কিছুতেই। কী টান মাছের! বর্শার সুতো একবার এদিক, এদিক-সেদিক। ইশ্! মাছগুলোকে ট্রেনিং দিয়ে যদি ভেলা টানবার কাজে লাগানো যেতে পারত!

মাছটা ফসকেই গেল শেষ পর্যন্ত, সেইসঙ্গে হারাল আমার বর্শাবন্দুক। 'পাওয়ার স্ট্র্যাপ' ছিঁড়ে পড়েছে সমুদ্রে, তারপর হারিয়ে গেছে অতলে। এখানে বর্শা-বন্দুক অকেজো হওয়ার অর্থই হল অনাহারে মৃত্যু। তবে কপাল ভালো, বর্শা এবং বন্দুকের বাঁটটা অক্ষত আছে। মাছ ধরার শক্ত সুতো দিয়ে বেঁধেছেঁধে আবার কাজ চালাবার মতো করে তুললাম বন্দুকটাকে। স্বাভাবিক কারণেই জোড়াতালি-দেওয়া বন্দুকের রেন্‌জ ছ'ফুট থেকে কমে তিন-চার ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই বন্দুক নিয়ে বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পরে একটা মাছ ধরলাম আমি। মাছটাকে কোনওমতে ভেলার ওপরে টেনে তোলার পরে মনে হল, আমার শরীরে আর একবিন্দুও শক্তি নেই! মাছের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন খাবি খাচ্ছিলাম। মাছটা কিন্তু ছিটকে উঠে পালাতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। এই আশঙ্কায় শরীরের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বেশ কয়েকবার ছুরি চালালাম মাছের ওপর। ধীরে-ধীরে মাছের ছটফটানি কমে গেল।

কয়েকটা সপ্তাহ মোটামুটি ভালোই কেটেছে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছি অনেকটা। একেবারে গোড়ার দিকে আমার খাদ্য ও পানীয় জলের পরিমাণ যা ছিল, এখনকার অবস্থা তার চেয়ে ঢের ভালো।

তবে এগুলো হচ্ছে ভালোর দিক, খারাপ দিকটাও নেহাত ছোটো নয়। শ্বেতসার, চিনি আর ভিটামিনের অভাবে আমার শরীর শুকিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। আমার পা-দুটো শুকনো, দড়িপাকানো গোছের হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

বুক এবং হাতও সরু হয়ে গেছে, তবে শরীরের নীচের দিকের তুলনায় কিছুটা মজবুত। আসলে দু-হাত দিয়ে তো বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে অবিরাম। তাতে ভালোরকমের ব্যায়ামের কাজও হয়ে যাচ্ছে।

গোটা শরীরে ক্ষতের সংখ্যা অনেক। হাঁটুর ক্ষতগুলো শুকোয়নি এখনও। হাতে বিস্তর কাটাকুটি, কিছু ক্ষত ছুরির আঘাতে, কিছু-বা মাছের কাঁটায়।

ডাকির ভেতরের অংশ শুকনো রাখার ব্যাপারে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু আমার প্রায় অর্ধেক সময় কেটে যাচ্ছে জলে ভিজে। নোনা জলে অতক্ষণ থাকার ফলে ফুসকুড়ি হয়, ফুসকুড়ি থেকে ফোঁড়া। ক্ষতগুলো যতখানি সম্ভব শুকনো রাখার চেষ্টা করছিলাম। খুব ধীরগতিতে হলেও তাতে কাজ হচ্ছিল কিছুটা।

৩ মার্চ, দিন ২৭

আর একটি সূর্যোদয়, মানে এই রবার ডাকিতে সাতাশ দিনে পা দিলাম আমি। ডাকির ঠান্ডা ছাউনিটা গুটিয়ে ফেলি আস্তে-আস্তে। সূর্য উঠছিল আকাশ লাল করে। ওদিকে তাকিয়েছিলাম এমন ভাবে, যেন একটি শিশু এই প্রথম সূর্যোদয় দেখছে!

বিচ্ছিরি একটা কাজ হল ডাকির টিউবে হাওয়া ভরা। আগে এত পাম্প করতে হত না, কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল পাম্পের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল তত। দুপুরে, সন্ধে, মাঝরাত্তির আর সকালে নিয়ম করে হাওয়া ভরি টিউবে। হাওয়া ভরার ধকল সাঙ্ঘাতিক।

পানীয় জল বানাবার স্টিলটারও দেখভাল করতে হয় প্রতিদিন। অনেক কষ্টে পানীয় জলের পরিমাণ আমি কিছুটা বাড়িয়েছি। ছোটো বোতলের আট বোতল জল সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়। ওই জল আমি জলের টিন, প্লাস্টিকের ব্যাগ আর জাগে ভরে রেখেছি। ওদিকে আমার 'কসাইখানা' ফিশ স্টিকে ভর্তি। তবে আমি কখনওই বেহিসেবি হচ্ছি না। জমানো মাছের পরিমাণ একটু কমে গেলেই মাছ ধরায় মন দিচ্ছি আবার।

হজমের গোলমালের মধ্যে যাতে না পড়ি — সে-ব্যাপারেও সতর্ক ছিলাম আমি। সময়-সুযোগ পেলে একটু এদিক-সেদিক করে কিছু যোগব্যায়ামের চর্চা করতাম। কাজ হয়েছিল তাতে।

ক্যানারিজ থেকে চিঠি লিখে আমি বাবা-মা ও বন্ধুদের জানিয়েছিলাম, "২৪ ফেব্রুয়ারি নাগাদ অ্যান্টিগুয়ায় আশা করতে পারো আমাকে।" তার মানে সেটা হল এখন থেকে দিনসাতেক আগের কথা। আমি অবশ্য এ-কথাও লিখেছিলাম, অনুকূল বাতাস না পেলে পৌঁছতে-পৌঁছতে ১০ মার্চও হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ আরও সাত দিন।

সাত দিন পরে আমার খোঁজ চালালেও কোনও লাভ হবে না। কারণ আমি সমুদ্রের ওই এলাকা থেকে বহু দূরে ভেসে এসেছি। কোনও জাহাজ যদি এখন আমাকে উদ্ধার করে তা হলে বাড়ির লোকজনকে আর দুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হবে না।

হঠাৎ একটা হাঙর দেখতে পেলাম জলের মধ্যে। হাঙরটা অবশ্য এদিকে এল না, ডিকি থেকে শতখানেক ফুট দূরেই থেকে গেল। ছোটো মাপের হাঙর, তবে ওটা আমার

www.BanglaBook.org

দিকে নজর দেয়নি বলে স্বস্তি বোধ করলাম। খাদ্যের আশায় হাঙরটা এখন বাতাস এবং স্রোতের বিপরীত দিকে এগিয়ে চলেছে ধীরে-ধীরে।

শুনেছি, হাঙররা বড়ো রকমের জখম হওয়ার ঝুঁকি নেয় না। তেমন ভাবে আহত হলে শিকার ধরা যাবে না। শুধু তাই নয়, ওই প্রজাতির অন্য কোনও প্রাণীর শিকার হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যায় তখন। এই সব কারণে অধিকাংশ হাঙর শিকার ধরার আগে 'শিকারকে' একটা ধাক্কা মারে। ধাক্কায় জবরদস্ত প্রতিরোধ না থাকলেই আক্রমণ হাঙরের কাছে অখাদ্য বলে কিছুই নেই। ওরা সব খায়। হাঙরের পেটে লাইসেন্স-প্লেট, নোঙর ইত্যাদিও পাওয়া গেছে।

বিশাল দুই সাদা হাঙরের কথাও মনে পড়ে গেল। এক-একটা হাঙর লম্বায় পঁচিশ ফুট, ওজন প্রায় চার টন। এইসব হাঙর সবরকম নিয়মকানুনের বাইরে। ভীষণ হিংস্র এবং শরীরে শক্তি ধরে প্রচণ্ড। কোনও শত্রুর তোয়াক্কা করে না। এদের হঠাৎ আক্রমণে বড়ো মাপের নৌকো পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তিমি মাছকেও খাতির করে না এরা।

'কিলার হোয়েল' বা 'ঘাতক তিমি'র কথাও মনে পড়ে গেল। এইসব তিমি বড়ো-বড়ো ইয়াটকে চোখের নিমেষে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম আর প্লাস্টিকে-মোড়া আমার ছোট্ট বর্শাটার দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি। এর ওজন কত হবে? বড়োজোর পাউন্ড দুয়েক। ছোট্ট মাপের একটা হাঙরকে এই বর্শা ছুড়ে মারলে কী ফল হতে পারে! একটা মশার কামড়ে আমি যতটা কষ্ট পাই, এই বর্শার খোঁচায় ওই হাঙরটা নিশ্চয়ই তার বেশি কষ্ট পাবে না।

রাত্তিরে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর দিনে উৎকট গরম। ভোর এবং সন্ধেই যা একটু আরামের।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি, মানসিক শান্তির সময়টুকু বড়ো সুখের। সাধারণত ঘণ্টাদুয়েক লেগে থাকলেই একটা মাছ ধরা যায়। তারপর রবারের তাঁবুর নীচে অখণ্ড বিশ্রাম। অতিমাত্রায় সহজ-সরল এই জীবনের তুলনায় আমার অতীত-জীবন কী ভীষণ জটিল! মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যিখানের বিশাল ফাঁকটা এই প্রথম আমার চোখে পড়ল। আমার এই সমুদ্রযাত্রাটির আগে সবই ছিল আমার আয়ত্তে। খাবারদাবার, আস্তানা, পোশাক, সঙ্গীসাথী — কী নয়! কিন্তু এতকিছু থাকা সত্ত্বেও আমি মাঝেমধ্যে অসুখী হয়ে পড়তাম। অ-সুখের কারণ কোনও একটা চাওয়া জিনিস হাতে না পাওয়া। যা চাওয়া যায় তার সবই তো পাওয়া যায় না। তবে এটা আমি বুঝতে চাইতাম না, একটা কিছু না পেলেই কষ্ট পেতাম খুব।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, অতীত-জীবনের সেই অভাববোধ একটুও নেই আমার। চারদিক যেন দুর্লভ সব সম্পদে ভর্তি। সুন্দরভাবে বয়ে-যাওয়া ঢেউয়ের মধ্যে ঈশ্বরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। ডোরাডোর সাঁতারের মধ্যেও তাঁর করুণাধারা, আমার গালে-লাগা হাওয়ায় তাঁর নিশ্বাসের স্পর্শ। সবকিছুর মধ্যেই দেখা যাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু তাঁর সর্বক্ষণের এই সঙ্গ পাওয়া সত্ত্বেও আরও-কিছু চাইছিলাম আমি। খাদ্য এবং পানীয়র বাইরেও আরও কিছু চাই। মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম আমি।

www.BanglaBook.org

মুহূর্তের এই প্রশান্তি ছাড়াও কিছু প্রয়োজন আছে আমার। কী সেটা? আমি একটা জাহাজ চাই। বাঁচার জন্যে এই মুহূর্তে একটা জাহাজ আমার বড়ো দরকার।

৬ মার্চ, দিন ৩০

৬ মার্চ রাত্তিরে প্রচণ্ড ঝড়। ভেলার মধ্যে আছাড় খেয়েছি সারা রাত্তির। এ যেন 'বাম্পার কার'-এ ঘুমোনোর চেষ্টা। পরদিন ঝড়ের গতি বেড়ে গেল আরও। ভয়ংকর ঝড় রবার ডাকিকে শূন্যে তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলছিল বারবার। মনে হচ্ছিল ঝোড়ো বাতাস ভেলাটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অ্যান্টিগুয়ায় ফেলবে। বাইরে নজর রাখার প্রশ্নই ওঠে না, ভেলার ছাউনি আমি আটকে রেখেছিলাম বেশ শক্ত করে।

৮ মার্চেও প্রচণ্ড ঝড়। ছাউনির ফাঁক দিয়ে ভেলার ভেতরে জল ঢুকছিল সমানে। সেই জল ছেঁচে বাইরে ফেলাই ছিল আমার একমাত্র কাজ। হঠাৎই মস্ত একটা আছাড় খেল ডাকি।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে আবার একটা মারাত্মক আছাড়। সম্পূর্ণ হতাশ আর পর্যুদস্ত হয়ে চারদিকের ভাসমান আবর্জনায় কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমি, তারপর গায়ের জোরে কয়েকটা ঘুসি চালিয়ে গালাগালি দিলাম সমুদ্রকে। মিনিট-পাঁচেক ধরে সমুদ্র আর ঝড়কে শুধু গালাগালি আর অভিশাপই দিয়ে গেলাম আমি। তারপরেই ভেঙে পড়লাম কান্নায়। "আমি কেন! সবাইকে ছেড়ে আমাকেই শুধু ওরা হয়েছে কেন? আমি শুধু বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলাম! ব্যস, আর কিচ্ছু না তো। কেন আমি বাড়ি ফিরতে পারব না?"

তাই শুনে আমার ভেতর থেকে কে যেন ধমকে উঠে আমাকে বলল, "ছেলেমানুষি কোরো না!"

কিন্তু ধমকে কোনও কাজ হল না। আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, "এখন আর বড়ো হয়েও কোনও কাজ হবে না। আমি আহত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। ভয়ও পাচ্ছি ভীষণ। কাঁদা ছাড়া আর কোনও পথ নেই, আমি তাই কাঁদছি।"

তখন আমি যা জানতাম না, তা হল এই — সেদিন, সম্ভবত সেই মুহূর্তেই, আমার বাবা ইউ এস কোস্টগার্ডকে জানিয়েছিলেন — নাপোলেয়ঁ সোলোর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ বন্দরে পৌঁছবার সময় পেরিয়ে গেছে। এই ঘটনার কিছুদিন আগে আমার মা রাত্তিরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। দুঃস্বপ্নটা হল, আমি কালো জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি! তাপর থেকে ভয়ংকর উদ্বেগ-উত্তেজনায় দিন কেটেছে তাঁর, কিন্তু আমার তরফ থেকে কোনও খবর আর যায়নি।

১০ মার্চ, দিন ৩৪

দু'দিনের প্রচণ্ড ঝড়ে প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কোনওমতে একটা ট্রিগারফিশ আর একটা ডোরাডো ধরেছিলাম। এই ডোরাডোটা আমার বর্শা বেঁকিয়ে দিয়েছে। বর্শা-বন্দুক ব্যবহারের সময় এবার থেকে আরও বেশি করে সতর্ক হতে হবে।

www.BanglaBook.org

১১ মার্চ। সবকিছু আবার আগের মতো শান্ত হয়ে এল। আমার পুরনো নিস্তরঙ্গ রুটিনে ফিরে এসেছি আবার। আন্দাজে একটা হিসেব কষে দেখলাম, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছি।

১৩ মার্চ, দিন ৩৭

আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য কিছুই আর ভালো লাগছিল না। বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় শেষতম ডোরাডোর টুকরোগুলো শুকোয়নি, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বেশ-কিছু।

বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পরে আর একটা ডোরাডো ধরলাম। তারপর কাটিং বোর্ডের ওপর চেপে ধরে ছুরি চালিয়ে কাটলাম মাছটাকে। সাধারণত গোটা মাছ কেটেকুটে পরিষ্কার করার পরে খাওয়াদাওয়া আরম্ভ করি। কিন্তু আজ এত খিদে পেয়ে গিয়েছিল যে, মাছ অর্ধেক কাটার পরেই খেতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

মাছের পাকস্থলী কীসে যেন ভর্তি। পাকস্থলী কাটতেই সামান্য হজম-হওয়া পাঁচটা ফ্লাইং ফিশ ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। একটু ইতস্তত করে একটা ফ্লাইং ফিশ তুলে নিয়ে মুখে দিলাম। ওহ্, কী উৎকট! বমি উঠে এল প্রায়। ফ্লাইং ফিশগুলো তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেললাম সমুদ্রে। কিন্তু তারপরেই মনে হল — ইশ্! কী বোকামি করে ফেলেছি! মাছগুলো ভালো করে ধুয়েটুয়ে পরে একবার খাওয়ার চেষ্টা করলেই হত ! এই অবস্থায় পাঁচ-পাঁচটা মাছের এত বড়ো অপচয় !

১৬ মার্চ, দিন ৪০

চল্লিশটা দিন টিকে গেলাম! তবে আমার পানীয় জলের সংগ্রহ ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। কসাইখানায় অল্প কয়েকটা শুকনো মাছের শক্ত টুকরো ঝুলছে। ডাকি চল্লিশ দিন টিকে থাকবে দিব্যি — এমন একটা গ্যারান্টি ছিল। এই ডাকি যদি এখন ডোবে, আমি কি টাকাপয়সা ফেরত পাব? কী মনে হয় তোমার?

ঝড়ঝঞ্ঝা বিস্তর গেছে, কিন্তু এখনও আমি মরিনি। একেবারে গোড়ার দিকে যা ভেবেছিলাম, তার চাইতে ঢের বেশি দিন বেঁচে আছি।

১৮ মার্চ, দিন ৪২

প্রতিটি দিনকেই এখন দীর্ঘতর বলে মনে হচ্ছে। আজ সমুদ্র শান্ত, কিন্তু অসম্ভব গরম। এ যেন গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় আগস্ট মাসের টিনের ছাত। প্রখর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হচ্ছিল জলকণায়।

আমার স্লিপিং-ব্যাগটা প্রয়োজনবোধে আমাকে ঠান্ডা ও গরম রাখতে সাহায্য করছিল। ভেজা ব্যাগ আমি ভেলার মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়েছিলাম শুকোবার জন্য। ভেজা ব্যাগের নীচে পা ছড়িয়ে বসে থাকলে সূর্যের তাপ এড়ানো যায় কিছুটা। এভাবে থাকাটা অবশ্য আমার শরীরের ক্ষতের পক্ষে ভালো নয়, কিন্তু অসহ্য গরমের হাত থেকে বাঁচার আর কোনও উপায় তো নেই। ভেজা ব্যাগ বিছিয়ে না দিলে ডাকির কালো মেঝে গরম হয়ে ভেলাটাকে নির্ঘাত অগ্নিকুণ্ড করে তুলত!

www.BanglaBook.org

কান্না ও ফিসফিসানি

নিউ ইয়র্ক কোস্ট গার্ড ৯ মার্চ ভার্জিনিয়া ও পুয়েরতো রিকো স্টেশন দুটিকে একটি বেতারবার্তা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিল। বার্তাটি ছিল নাবিকদের উদ্দেশে। একটি ইয়াটের বন্দরে পৌঁছবার সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেটির কোনও খোঁজ নেই। গভীর সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজ এবং প্রমোদ-তরণীগুলি সাধারণত এই ধরনের খবর প্রচার করে থাকে।

লন্ডনের লয়েড্‌সের মাধ্যমে কোস্ট গার্ড ক্যানারিজেও আমার খোঁজ নিয়েছিল। কিন্তু সরকারি নথিপত্রে আমার হিয়েরোতে থাকার কোনও রেকর্ড ছিল না। সুতরাং জানুয়ারির শেষে আমার ওই দ্বীপ থেকে সমুদ্রে ভেসে পড়ার খবরটিই তারা বিশ্বাস করতে চাইল না। কিন্তু ঘটনাটি যে অতিমাত্রায় সত্যি — আমার বাবা-মা তা প্রমাণ করলেন অন্য ভাবে। হিয়েরো থেকে আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম ওঁদের, সেই চিঠিতে ওই দ্বীপের ডাকবিভাগের সিলমোহর ছিল। সেই চিঠি দেখাবার পরে মত পালটেছিল কোস্টগার্ডরা।

কেউই পরিষ্কার করে জানাতে পারল না ঠিক কবে ক্যানারিজ ছেড়েছি আমি, কিংবা কোন পথ ধরেছি! সোজা পথ? নাকি কেপ ভের্দ দ্বীপমালা হয়ে? আমার পরিবারের সবাই জানত — আমি কেপ ভের্দের পথ ধরিনি। কিন্তু কোস্টগার্ডরা ওদের কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিল না।

সমুদ্র অগাধ। গতিবিধি মোটামুটি জানা থাকলেও এই সমুদ্রে কোনও নৌকোর হদিস পাওয়া প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার। কোস্ট গার্ড আমার পরিবারের লোকজনদের অনেক কথা বললেও একটি কথা বলতে পারেনি। সেটি হল —বন্দরে পৌঁছবার সময় সপ্তাহখানেক পেরিয়ে গেলে ধরে নেওয়া উচিত, মারা গিয়েছে যাত্রীটি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরকম ঘটনাই ঘটে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৩৭৪ জন নাবিক।

কোস্টগার্ডের জন্য বরাদ্দ টাকা কমে যাওয়াও ওই বিভাগটি এখন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। গার্ডের সংখ্যা কম, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও অভাব আছে কিছু। আমার জন্যে সমুদ্রে 'সার্চ পার্টি' পাঠালেও খুব একটা কাজে আসত না, কারণ আমি তো এখন ওই এলাকা থেকে বহু দূরে। কোস্ট গার্ড স্পষ্ট ভাষায় আমার পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, নাপোলেয়ঁ সোলোর জন্যে বিমান পাঠাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

গার্ডরা বিভিন্ন বন্দরে আমার খোঁজাখুঁজির পাট চুকিয়ে দিলে ১৮ মার্চের মধ্যে। না, কেউই দেখতে পায়নি সোলোকে।

১৯ মার্চ, দিন ৪৩

মাছ ধরতে গিয়ে আমার ব্যর্থ হওয়া এখন আর নতুন কোনও ঘটনা নয়। ও নিয়ে অবশ্য আলাদা করে মাথাও ঘামাই না। শুধু টের পাই, মানসিক দিক দিয়ে আমি কেমন

www.BanglaBook.org

যেন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছি। ডোরাডোগুলো আমার কাছে এখন আর নিছক খাদ্য নয়, তার চাইতে ঢের বেশি-কিছু। পোষা প্রাণীরও ওপরে ওদের জায়গা।

ঠিক আমার মতোই ওরা—তবে কয়েকটি ব্যাপারে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। খাদ্যের জোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। সঙ্গ দিচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ভাবে। ওদের আক্রমণ কিংবা প্রতিরোধ ঠিক যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো। একই সঙ্গে আবার মাছগুলো বন্ধুর ভূমিকাও পালন করে যাচ্ছে।

সবই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু মস্ত এক ঝামেলায় পড়লাম আমার বর্শা-বন্দুক নিয়ে। বন্দুকের মাথার দিকে প্লাস্টিকের একটা 'লুপ' ছিল, সেই লুপে ফাটল ধরেছে। ফাটল আর একটু বাড়লেই সর্বনাশ। অকেজো হয়ে যাবে বন্দুক। আর বন্দুক অকেজো হওয়ার অর্থই অনাহারে মৃত্যু।

দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধলাম লুপ আর বর্শা। বিদঘুটে চেহারা হয়েছিল বন্দুকটার। তবে মনে হয় এটা দিয়ে অল্প কিছুদিন কাজ চলে যাবে কোনওমতে।

সকালবেলায় ভেলার পাশে মাছেদের একটা মিছিল দেখতে পেলাম। বাহ্! চমৎকার! বন্দুক ছুড়লাম একটা মাছকে তাক করে। কিন্তু বর্শা মাছের গায়ে বিঁধতেই ভয়ংকর এক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল জলের মধ্যে। মাছটা লাফিয়ে উঠেই ডিগবাজি খেল। ওই আঘাতে বর্শার মাথা ছিটকে বেরিয়ে এল বন্দুক থেকে। বন্দুকটাও হাতের বাইরে। লাফিয়ে পড়লাম ওগুলো উদ্ধারের জন্যে।

তারপরেই কানফাটানো বিকট এক আওয়াজ। মাছের শরীর থেকে ভেলার নীচের টিউবে গেঁথে গেছে বর্শার ওই মাথাটা। টিউব ফাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছিল। একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে ডাকি। হায় ভগবান! ইঞ্চি-চারেক মাপের একটা গর্ত হয়ে গেছে ভেলায়!

নীচের টিউবের হাওয়া বার হতেই ভেলা ডুবল কিছুটা। ওপরের টিউব অটুট না থাকলে তলিয়ে যেতাম কখন!

শরীরের প্রায় আধখানা ডুবে আছে জলের মধ্যে। এই ভাবে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারব কে জানে !

বাঁচার আশাতেই জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করলাম ভেলায়। কিন্তু আমার 'রিপেয়ার কিট''-এ যে 'প্লাগ' ছিল তা মাপে খুবই ছোটো। ওসব দিয়ে ভেলার অত বড়ো ওই গর্ত বন্ধ করা যাবে না। এখন উপায়?

সোলো থেকে ফোমের যে কুশনটা এনেছিলাম সেটাই এবার আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করল। 'ক্লোজড-সেল' ফোমের একটা টুকরো কেটে ভেলার গর্ত বন্ধ করলাম অতি কষ্টে।

ওই টিউবে হাওয়া ভরা ভয়ংকর এক পরীক্ষা। কিন্তু অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করার পরে ওই পরীক্ষাতেও পাস করলাম আমি। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় নীচের টিউব আবার ভেসে উঠল জলের ওপর।

www.BanglaBook.org

কপালজোরে বর্শা আর বন্দুকটাও উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমি। কপাল সত্যিই ভালো, ফুট-দশেক মাপের মস্ত এক হাঙর আমার ঠিক পাশে এসেও দয়া করে নজর দেয়নি আমার দিকে।

প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওই হাঙরটাকে খোঁচা মেরেছিলাম বর্শা দিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এ যেন টুথপিক দিয়ে আস্ত একটা পাহাড় নাড়াবার চেষ্টা করা!

২০ মার্চ, দিন ৪৪

ডাকি আবার আগের মতোই ভাসছে, তবে ভাসিয়ে রাখার জন্য বেশ চড়া দাম দিতে হচ্ছে আমাকে। প্রতি দু-ঘণ্টায় চল্লিশটা পাম্প দরকার ভেলার। হিসহিস শব্দ থামেনি, অল্প করে হলেও হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে টিউব থেকে।

যন্ত্রণায় হাতের পেশি ছিঁড়ে পড়ছিল, কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার কোনও উপায় নেই। সোলার স্টিলটা বিগড়ে গেছে, ওটা ঠিকঠাক করতে হবে। শুকনো মাছের মজুতও শেষ।

বর্শা-বন্দুকের দফা রফা।

ভেলার চারপাশে কয়েক ঝাঁক ডোরাডো। মাছগুলোর দিকে আমি তাকিয়েছিলাম অন্য চোখে। এরা আমার ভেলা জখম করেছে, নিরস্ত্র করেছে আমাকে, এখন নির্ঘাত মজা করছে যাত্রীটিকে নিয়ে।

বন্দুক সারাইয়ের কাজে লেগে গেলাম আবার। ইকুইপমেন্ট ব্যাগে টুকিটাকি অনেককিছু ছিল। এ-সবের ভেতর থেকে ছুরি আর কাঁটা বার করে নিলাম আমি। বর্শার মাথা বেঁকে- চুরে গেছে। নতুন ফলা হিসেবে ছুরিটাকে বাঁধলাম। দেখা যাক কী হয় এখন!

আচ্ছা, সুতোয় বঁড়শি বেঁধে জলে ফেললে কেমন হয়? ভালো টোপও আছে। বঁড়শির মাথায় শামুকের টোপ দিয়ে জলে ফেললাম সুতো। ঘণ্টাখানেক বাদে টান পড়ল সুতোয়। টান দেখে মনে হচ্ছে বেশ বড়ো মাপের মাছ!

সুতো টানতে লাগলাম আস্তে আস্তে। তারপরেই এক চমক। সুতোর টানে জলের ওপর ভেসে উঠল বেলুনের মতো একটা মাছ। শজারু মাছ! শজারু মাছ তার গায়ের ধারালো সব কাঁটাগুলো ফুলিয়ে তুলেছিল। শুনেছি এই জাতের মাছগুলো খুব বিষাক্ত হয়। তা ছাড়া ওই সব কাঁটা রবারের ভেলাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। সুতো ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বঁড়শির বাঁধন আলগা করে শজারুর হাত থেকে নিস্তার পেলাম আমি।

সন্ধের মুখে একটা ট্রিগারফিশ ধরলাম। ছোট্ট ওই 'গণ্ডারটাকে' সাফসুফ করতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। মাছটার কিছুই তেমন ফেলিনি আমি।

২২ মার্চ, দিন ৪৬

দি নিউ ইয়র্ক কোস্ট গার্ড নাপোলেয়ঁ সোলো-সংক্রান্ত বেতারবার্তাটি বাতিল করে দেয়। ওই সঙ্গে লন্ডনের লয়েড্‌স, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ-কর্তৃপক্ষ এবং মিয়ামি ও পুয়েরতো

www.BanglaBook.org

রিকো কোস্ট গার্ড স্টেশনগুলিতে জানিয়ে দেয়, 'অনুসন্ধানের কাজ উপস্থিত বন্ধ।' আমার পরিবারকে এই খবর জানাবার জন্যে ১ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল ওরা।

শূন্যে দিগন্তের দিকে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতাম আমি। সজাগ থাকতাম—প্রপেলারের শব্দ শোনা যায় যদি! ভালোভাবেই জানি, এত দূরে আমার খোঁজে আসবে না কেউ। তা ছাড়া প্রত্যেকেই নির্ঘাত ধরে নিয়েছে—মানুষটা আর বেঁচে নেই।

জোড়াতালি-দেওয়া টিউবের অকথা খারাপ হয়ে এল আবার। টিউব জলের নীচে কিছুটা যাওয়ার অর্থই হল ভেলায় জল ঢোকা। ওই জলের মধ্যে শরীরের কিছুটা অংশ ডুবেই থাকল।

শরীরে ক্ষত তো ছিলই, নোনা জলে সেগুলো বেড়ে গেল আরও। নতুন কয়েকটা ক্ষতও তৈরি হল। আর, সারা দেহে কী যন্ত্রণা! ওদিকে আবার খিদের কষ্ট!

বিচিত্র ওই বর্শা-বন্দুকে মাছ মারার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনও সুবিধে হল না। তখন বন্দুকটাকে নিয়ে পড়লাম আবার। ভেলায় একটা 'লেদার নাইফ' ছিল, সেটা আর আগের ছুরিটুরি দিয়ে উদ্ভট চেহারার এক বর্শা বানালাম। ফলার আকৃতি ইংরেজি 'ভি' হরফের মতো। এগুলো হারালে ধাতুর টুকরো বলে আর কিছুই থাকবে না আমার।

ভেলার টিউব মেরামতির চেষ্টা আমি চালিয়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। তবে হাল ছাড়লে চলবে না। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে সমুদ্র-নোঙরের কাপড়টা কাজে লেগে গেল অদ্ভুত ভাবে। না, আর হাওয়া বার হচ্ছে না। হাওয়া-ভর্তি টিউব ভেসে উঠল আবার জলের ওপর। জলের মধ্যে অর্ধেক ডুবে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে বহুক্ষণ বাদে মুক্তি পেলাম আমি।

রকার ডাকির চেহারা হয়েছে এখন কুৎসিত-দর্শন সামুদ্রিক এক প্রাণীর মতো। মস্ত হাঁ, বিকট চেহারার জিভ ঝুলে পড়েছে বাইরে। হাঁয়ের মধ্যে আমি দুলছি রুগ্ণ এক টনসিলের মতো।

খাবারের স্বপ্ন দেখছি আগের চাইতে ঢের বেশি। স্বপ্নের মধ্যে খাবারের গন্ধ নাকে লাগছিল। স্বপ্নের মধ্যেই একটা খাবার চেখে দেখলাম। তবে কোনও লাভ হয়নি তাতে। বাস্তব জগৎটা আগের মতোই রূঢ়। খাওয়ার পরেও বেশ খিদে থেকে যায়। কপাল ভাল, উদ্ভট চেহারার বর্শাটা কাজে লেগে গেল চমৎকার ভাবে। ওটা দিয়েই একটা ডোরাডো মারলাম। মাছটা ভেলায় তোলার সময় ভয় লাগছিল বর্শার ভয়ংকর ফলা দেখে। বেকায়দায় ওটা যদি রবারের টিউবে ঢুকে যায়! বর্শা সামলে মাছ তুললাম ভেলায়। তারপর 'খাবার! খাবার!' বলে আনন্দে প্রায় নেচে উঠলাম আমি।

আমার বানানো বর্শায় কাজ হয়েছে দিব্যি। ডিকিও ভেসে চলেছে চমৎকার। সামনে মজুত খাদ্য। দুর্ঘটনা না ঘটলে আরও কয়েকটা দিন স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারব আমি।

একটা উড়ুক্কু মাছ ধরায় খাদ্যের পরিমাণ আর একটু বাড়ল। এই মাছগুলো খুব সুস্বাদু। মাছটার আঁশ ছাড়িয়ে কেটেকুটে রেখে দিলাম যত্ন করে।

www.BanglaBook.org

উড়ুক্কু মাছ বেশ মজার। জলের আশ্রয় ছেড়ে অনেক সময় শতখানেক গজ পর্যন্ত উড়ে যায় অনায়াসে। রাত্তিরবেলায় এইসব উড়ন্ত মাছের ঝাঁক মাঝেমধ্যে কোনও নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়ে। আছড়ে পড়ার শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের গুলির শব্দের মিল আছে বেশ।

ভেলা ভাসছিল আগের মতোই। হঠাৎ হিস-হিস শব্দ। কী হল? সর্বনাশ! ভেলার নীচের টিউবের হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে আবার। ফোমের প্লাগ খুলে গেছে, আর ওই পথেই হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে প্রবল গতিতে। দেখতে দেখতে চুপসে গেল একটা টিউব। আমার শরীরের অর্ধেক এখন আবার জলের মধ্যে।

ভেলা সারাবার প্রাণান্তকর পরিশ্রম শুরু হল ফের। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু সামান্য একটু বিশ্রাম নেওয়ারও উপায় নেই। অনেক কষ্টে জোড়াতালি দিয়ে ভেলাটাকে ভাসালাম। ডাকি ভাসল বটে, কিন্তু টিউব থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার শব্দটা বন্ধ হল না একেবারে।

তুবড়ে যাওয়া ভেলায় রাত্রিবাস অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কেননা বেশ বড়ো মাপের ঢেউ একটার পর একটা সমানে আছড়ে পড়ছিল ভেলার গায়ে।

২৭ মার্চ, দিন ৫১

সকাল ন'টা নাগাদ ভেলার সেই তাপ্পি খুলে গেল আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেলায় জল ঢুকে গেল অনেকটা। আমি জলের মধ্যে। জলের মধ্যে আমার খাদ্য—মজুত মাছের একটা অংশ। এই জলে বেশিক্ষণ থাকলে মাছ নির্ঘাত পচে যাবে। শরীরে অসংখ্য ক্ষত, নোনা জলে ওইসব ক্ষতের জ্বালা বেড়ে গিয়েছিল বেশ।

গত সপ্তাহে খাওয়া, ঘুম—কিছুই তেমন হয়নি। আর, কাজ করেছি একটানা। এখন, এই অবস্থায় আমার শরীর আর চলছে না, মাথা কাজ করছে না। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। কিন্তু না, ভয় পেলে চলবে না। ফেঁসে-যাওয়া টিউব সারাতে হবে আবার। কিন্তু কী ভাবে সারাব? অসম্ভব ক্লান্ত আমি। আমার হাত যেন আর নড়ছে না।

চুপ করো। সারাইয়ের কাজটা তোমাকে করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। নাও, ওঠো। যাও। আমি আমার বিধ্বস্ত শরীরটাকে যেন আদেশ দিচ্ছিলাম।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম কিছুটা। ফেঁসে-যাওয়া টিউবের অংশ দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। কিন্তু বাঁধন কেটে গেল। ওদিকে সমুদ্রের এলোমেলো ঢেউ আমাকে বারবার আছড়ে ফেলছিল ভেলার মধ্যে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। হাত নাড়তে পারছি না। না, আর কিছুই বোধহয় করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

না, ওঠো, হাত লাগাও। চেষ্টা করো আবার। কিন্তু কীভাবে করব? গোটা পৃথিবীটা যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। হাত কাঁপছে। শরীরের চামড়া ফেটে যাচ্ছে। পাম্প দাও টিউবে। ক'বার? জানি না, গোনা সম্ভব নয়। হয়তো তিনশো। ওপরের টিউবেও হাওয়া লাগবে। ধরো, আরও নব্বইটা পাম্প। কিন্তু কীভাবে দেব!

www.BanglaBook.org

আমার হাতদুটো যেন খুলে আসছে ওপরের জোড় থেকে। ভেলার কাটা জায়গায় বাঁধন দিলাম আবার। কিন্তু বাঁধন কেটে গেল। আবার সেই এক চেষ্টা, আবার সেই একই ফল।

দিনের শেষে রাত নেমে এল। কী অসম্ভব ঠান্ডা! কিন্তু আমার শরীরে বিন্দুমাত্র কাঁপুনি নেই। প্রাণও নেই বোধহয়। ভেজা কম্বলের মতো সমুদ্রে ভাসছিলাম আমি। অসাড় শরীর। এই তা হলে অন্তিম মুহূর্ত!... মনে হচ্ছিল আমার চারপাশে অসংখ্য মুখ। ফিসফিস করতে করতে এগিয়ে আসছে মুখগুলো। অস্পষ্ট গলার ডাক সবার মুখে : এসো, সময় হয়ে গেছে।

২৮ মার্চ, দিন ৫২

অন্ধকার থেকে প্রেতেরা বেরিয়ে এসে টানতে লাগল আমাকে নীচের দিকে। আমি পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি, মৃত্যুর মুখোমুখি আমি।

"না!" চেঁচিয়ে উঠলাম। "না, এ ভাবে মরতে চাই না আমি।"

চোখের জল আমর গাল গড়িয়ে সমুদ্রে মিশে যাচ্ছিল। আমার শরীরের চারদিকে এখন বিপুল জলরাশি। মৃত্যু আসন্ন ... কিন্তু না, আমি বাঁচতে চাই।

উদ্বেগ, আতঙ্কের কোনও সীমা ছিল না। সামনের সব কিছুই অনিশ্চিত। তবু আমি কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠলাম, "আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।"

না, তুমি বাঁচতে পারবে না।

পারব, অবশ্যই পারব।

অদৃশ্য সব প্রেতের সঙ্গে তর্ক করার পরে অবসন্ন শরীরটাকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলাম আমি। চেপে ধরো। ধাক্কা মারো। আবার। বাহ্! ওপরদিকে একটুখানি উঠেছে। এখন আর ডোবার ভয় নেই। জোরে নিশ্বাস নাও। চমৎকার। সাবধান! একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ভেলায়। ঠান্ডা। ঠিক আছে, ঘাবড়াবার কিছু নেই; তোমার মাথাও ঠান্ডা রাখো। ব্যাগটা রাখো গায়ের ওপর। বেশ। বিশ্রাম নাও এবার। ভয়ংকর ওই বিপদের হাত থেকে এখনকার মতো বেঁচে গিয়েছ। আর কোনও ভয় নেই। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?

পাচ্ছি।

ঠিক আছে।

এবার? পরের ধাক্কাটা সামলানো কিন্তু সহজ হবে না।

চুপ করো। যে করেই হোক ধাক্কা সামলাতে হবে তোমাকে। শরীর গরম রাখতে হবে, ঘুমোতে হবে, চিন্তা করতে হবে। হয়তো আর একটাই মোটে সুযোগ পাবে তুমি। কিংবা তাও বুঝি নয়। তবে চেষ্টা তোমাকে চালিয়ে যেতেই হবে—বাঁচার চেষ্টা। না হলে তুমি মরবে, মরবেই।

না, আমি বাঁচব। বাঁচতে চাই আমি।

www.BanglaBook.org

ভেতরের মানুষটার কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়ার পরে বাঁচার চেষ্টায় লেগে পড়লাম।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরে শক্তি আসতে লাগল একটু-একটু করে। ঠান্ডা দেহে উত্তাপ ফিরল বাঁচার লড়াই কিছুক্ষণ চালাবার পরে। ছোটখাটো কিছু মাছ জুটেছিল, সেগুলো খেয়ে খিদে তাড়ালাম। এ রাত কাটবে কি না কে জানে! তবে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না।

ভেজা জায়গা থেকে সরে গিয়ে শুকনো জায়গায় দলা পাকিয়ে বসে শরীর গরম রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম আমি। অবশেষে চোখের সামনের ঘন কালো রং ফিকে হয়ে এল, তারপর ধূসর আকাশে ছোপ ধরল কমলা রঙের। আরও একটা সকাল দেখতে পেলাম।

বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। তবে একটানা নয়, দুটি কাজের মাঝে কিছুক্ষণের বিরতি। তখন শুধুই বিশ্রাম। টিউবে হাওয়া ভরলাম। যে কাজ অনায়াসে পাঁচ মিনিটে সারা যায়, সেটা সারতে পাক্কা আধঘণ্টা লাগিয়ে দিচ্ছিলাম আমি।

অনেক কষ্টে হাওয়া ভরলাম টিউবে। কিন্তু ঘণ্টাদেড়েক বাদে টিউব নরম হয়ে গেল আবার। তাই দেখে বিচ্ছিরি এক হতাশায় আক্রান্ত হলাম আমি। কিন্তু না, হতাশা দূর করতে হবে। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে লড়াই চালিয়ে যাব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এর কোনও বিকল্প নেই।

চেষ্টা চালাবার দাম পেলাম শেষে। ডাকি আবার জলে ভাসল ভালোভাবে। বিদঘুটে চেহারা হয়েছে ডাকির, কিন্তু পরের বারো ঘণ্টা ভেলায় আর হাওয়া ভরার প্রয়োজন হল না।

খিদেতেষ্টা আর শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম রীতিমত। কিন্তু কিছুটা আনন্দ আসছিল অন্য পথে। এ আনন্দ সাফল্যের আনন্দ। ডাকিকে ভাসাতে পেরেছি আবার।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলাম দু-দুবার। সোলো যে রাতে ডুবেছিল—সেই রাত আর কালকের রাত—ভয়ংকর এই দুটি রাতের যে-কোনও মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারত আমার। মনে হচ্ছে এই নিয়ে দু-বার যেন ফিরে এলাম নরক থেকে।

কিন্তু খাবার কোথায়? মাছ নেই একটাও। পানীয় জলের পরিমাণ যৎসামান্য। প্রচণ্ড খিদে-তেষ্টার মধ্যেই রাত্রি নেমে এল একসময়। অশান্ত সমুদ্র একটার পর একটা আঘাত হেনেই যাচ্ছিল আমাকে। কিন্তু সজাগ থাকতে পারলাম না। চেতনা লোপ পেল একসময়। কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ভোরে।

এই ভেলায় তিপ্পান্ন দিনে পা দিয়েছি আমি। মেঘ সরিয়ে সূর্য উঠেছে। জোরালো হাওয়ায় সামনের দিকে ভেসে চলেছিল আমার ভেলা। ভেলার তাপ্পিটা ঢিলে হয়ে গেছে, তবে কাজ চলে যাচ্ছে এখনও।

ভেলার যা দৃশ্য! দেখে মনে হচ্ছে—ওপর দিয়ে একটা রেলগাড়ি চলে গেছে। তবে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাপ্পি খুলে গেলেও ভেলাটাকে বোধহয়

www.BanglaBook.org

সারিয়ে তুলতে পারব আবার। কিন্তু শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। বড়ো ধরনের কোনও দুর্যোগের মধ্যে পড়লে আর হয়তো সামলে উঠতে পারব না!

সমুদ্রযাত্রার একেবারে গোড়ার দিকে আমার শরীর আর মনের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। মন যা চাইত, শরীর তাই করত। কিন্তু এখন আর তা করছে না, করতে পারছে না। শরীর একেবারেই বিধ্বস্ত, ওই শরীরের পক্ষে মনের সব আদেশ পালন করা প্রায় অসম্ভব।

বিশ্রাম চাইছে শরীর, আর চাইছে অসহ্য এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে। শরীরে অসংখ্য ক্ষত। কিন্তু আমার ফার্স্ট এডের ছোট্ট বাক্সটা বার করছিলাম না। এখন থাক। আরও বড়ো কোনও আঘাত পেলে বার করা যাবে। শরীর আর মনের মধ্যে বিরোধ লেগেই আছে, একটা সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

স্টিলটা কাজ করছে না ঠিক ভাবে। রোজ রাতেই স্টিলের হাওয়া বেরিয়ে যায়। সকালে নোনা জল ফেলে দিয়ে ফোলাই ওটাকে। তারপর সারাদিন অল্পবিস্তর পরিচর্যা তো লেগেই থাকে। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায় — দিনের শেষে অল্প পরিমাণে পানীয় জল।

গতকাল থেকেই মাছ ধরার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি আবার। ডোরাডোরা খুব কাছে ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু বর্শা হাতে নিতেই দূরে সরে গিয়েছিল ওরা। সব চেষ্টাই ব্যর্থ।

তবে, সন্ধের মুখে একটা ট্রিগারফিশ ধরলাম। তারপর আরও একটা। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল আমার। প্রায় লাফিয়ে পড়ে একটা মাছ খাওয়ার পরে শরীরে স্বস্তি ফিরে এসেছিল আবার।

আজ সকালে বাকি ট্রিগারফিশটা শেষ করলাম। এর পর কী জুটবে জানি না! একগাদা সারগাসো ভেসে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। জলজ উদ্ভিদের মস্ত একটা টুকরো তুলে নিলাম। ওর মধ্যে ছোট্ট-ছোট্ট চিংড়ি পেলাম কয়েকটা। আধ ইঞ্চি মাপের একটা মাছও পেয়েছিলাম। আর পেয়েছিলাম খুবই ছোটো আকারের কিছু কাঁকড়া। দাঁড়া ভেঙে কাঁকড়াগুলো রেখে দিলাম আমি।

সন্ধের দিকে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি দেখে খুব খুশি হলাম আমি। বৃষ্টি মানেই পানীয় জল। আউন্স-দশেক পরিষ্কার জল সংগ্রহ করলাম আমি। ভেলার ছাউনিটা এখন নামেই ছাউনি। হাল খুব খারাপ। ছাউনি ভেদ করে বৃষ্টির জল ভেতরে পড়ছিল হুড়মুড় করে। বৃষ্টির জল কিছুটা খাওয়ার পরে আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল আবার।

বৃষ্টি শুধু খাওয়ার জলই নয়, অন্য একটা উপহারও নিয়ে এসেছিল আমার জন্যে। বৃষ্টিতে দিক ভুল করে একটা বড়ো মাপের উড়ুক্কু মাছ আমার ভেলায় এসে পড়েছিল! একটু বাদে আর একটা।

পরে, একটা ফ্লাইংফিশের মাথা বঁড়শিতে গেঁথে জলে ফেলেছিলাম সুতো। দেখা যাক, এই টোপে ডোরাডো ধরা যায় কি না! হ্যাঁ, পরিষ্কার দেখলাম টোপ গিলেছে ডোরাডো। একটা হ্যাঁচকা টানে বঁড়শিতে গেঁথে ফেলেছি মাছটাকে।

www.BanglaBook.org

এবার শুধু ওপরে টেনে তোলা। দিব্যি উঠেও আসছিল। তারপর হঠাৎ ওটা গতি পালটে জোরালো টানে সুতো ছিঁড়ে হারিয়ে গেল গভীর জলে। বুঝতে পারলাম, বঁড়শিতে ডোরাডো ধরা অসম্ভব।

আন্দাজি হিসেবে মনে হল আমি অ্যান্টিগুয়ার ৪৫০ মাইলের মধ্যে এসে গিয়েছি। দূরত্ব অবশ্য আরও অনেক কম হতে পারে। তবে ওখানে পৌঁছতে হয়তো দিন-আঠারো লেগে যাবে। ভয়ংকর এই যাত্রার গোড়ার দিকে আঠারোটা দিন পার করে দেওয়ার কথা ভাবতেই পারিনি আমি। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই দিনগুলো আমার পাওয়া খুব দরকার।

এখন আমার যা-কিছু আছে, সবকিছুরই অবস্থা বেশ জীর্ণ। শরীরটাকে জীবন্ত শব বললেও বোধহয় ভুল বলা হবে না। শরীরে পচনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। তবু, যে-কোনও অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি রাখতে হবে নিজেকে।

সন্ধেয় বর্শা দিয়ে একটা মাছ মারলাম। কিন্তু বর্শার ফলার আঘাতে ছোটো একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল ভেলার মেঝেয়। খুবই ছোটো গর্ত, এই গর্ত মেরামত করা যাবে না। একটু ঝুঁকি নিলাম আমি। ছুরি দিয়ে গর্তের মুখ সামান্য বড়ো করে ওখানে একটা প্লাগ বাসিয়ে দিলাম চেপে।

রাত্তিরে বৃষ্টি হল কয়েক পশলা। ওই বৃষ্টিতে ভেলার সবকিছুই ভিজে গিয়েছিল। খাওয়ার জল সংগ্রহ করেছিলাম, তবে পরিমাণে অল্প। বহু দূর দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছিল, পশ্চিমমুখো। এখন আকাশে আতশবাজি ছোড়া অর্থহীন। জাহাজের কেউ অত দূর থেকে এই বাজি দেখতে পাবে না। এটা ঠেকে শিখেছি আমি। মাসখানেক আগে হলে বহুদূরের ওই জাহাজের উদ্দেশে নির্ঘাত তিন-চারটে বাজি নষ্ট করতাম।

তা ছাড়া, কেমন এক আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, বোধহয় একটু বেশি পরিমাণেই। কোনও জাহাজ আমাকে উদ্ধার না করলেও কিছু এসে যায় না। আমি এইভাবে ভাসতে-ভাসতেই একটা দ্বীপে পৌঁছে যাব একদিন।

সকালের আকাশ মেঘলা থাকায় স্টিলে পানীয় জল তৈরির কাজটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আমার মনোবল বেড়ে গেছে। সামনে কিং কিং-এর ব্রেকফাস্টঃ মস্ত-মস্ত স্টেক, কোয়ার্টার পাউন্ড ডিম, হৃৎপিণ্ড, চোখ আর বিস্তর চর্বি। আহ্!

জল থেকে আরও কিছু আগাছা তুলে নিতেই একটু দূরে একটা মাছ দেখতে পেলাম। ডোরাডো নয়, তবে ওই মাপেরই। বেশ পাতলা চেহারা। বারদুয়েক চোখে পড়ল মাছটা। ব্যারাকুডা? হাঙর? ঠিক কী জাতের প্রাণী — তা জানার জন্যে আদপেই ব্যগ্র নই আমি। বড়ো কথা হল, আমার জগতে নতুন অতিথি এসেছে।

টের পাচ্ছিলাম কিছু-একটা ঘটছে। একজন স্কাউট পড়ে-থাকা ছাইয়ের উত্তাপ পরখ করে বুঝতে পারে কতক্ষণ আগে ক্যাম্পফায়ার হয়েছিল। কতক্ষণ আগে লোক ছিল সেখানে! আমার ভূমিকাও এখন বোধহয় ওই স্কাউটের মতো। বুঝতে পারছিলাম, আমার আশেপাশে মস্ত কোনও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

নতুন ধরনের পাখিও দেখতে পাচ্ছিলাম আকাশে। দূরের আকাশে দুটো পাখি মারামারি করছিল। কী পাখি? মনে হচ্ছে টার্ন। রবার্টসনের বইয়ের একটি চার্টে টার্নের প্রবাসে যাওয়ার পথ আঁকা আছে। আমার হিসেবে আমি এখন ওই পথের বিশেষ এক জায়গায়।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীরা সমুদ্রযাত্রায় সামনে ডাঙা আছে কি না জানার জন্যে বিশেষ কিছু সংকেত ও চিহ্নের ওপর নির্ভরশীল ছিল। গভীর সমুদ্রের ঢেউ বেলাভূমিতে ধাক্কা দিয়ে ফিরে আসার সময় বিশেষ আকার ধারণ করে। তীরের আকাশে উষ্ণ জলস্রোত থেকে পুঞ্জমেঘ তৈরি হয়। রাতে ডাঙার কাছে ফসফরাসের আলো জ্বলে। সামনে শক্ত জমি আছে কি না জানার নানা উপায় আছে এইরকম। কিন্তু কোনও উপায়ই কাজে লাগছে না এখন। ডাঙার আভাস পাচ্ছি না কোথাও। ডাঙা আছে কি না জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হল, সত্যি-সত্যি ডাঙা দেখা। না, কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে না।

জোর করে ভাববার চেষ্টা করছিলাম, আমার হিসেবটা ভুল। আমি নির্ঘাত কমিয়ে-কমিয়ে দেখেছি সবকিছু। জলের স্রোত আর ভেলার গতি দিয়ে আমি যে অঙ্কটা করেছি, সেটা নির্ঘাত গোলমেলে। আসল গতি নিশ্চয়ই ঢের বেশি।

দিগন্তে স্থায়ী, অটুট কিছু দেখার আশায় চেয়েছিলাম। ওই স্থায়ী, অটুট আকারটি সবুজ হয়ে উঠবে আস্তে-আস্তে। কিন্তু না, তা আর হচ্ছে না কিছুতেই। নিরেট বস্তুর আভাস হয় পক্ষিরাজ, নয় দেবদূত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

মার্চের শেষ। এপ্রিলের বৃষ্টিতে কি বসন্তের পূর্বাভাস পাব, নাকি পয়লা এপ্রিলে 'এপ্রিল ফুল!'

১ এপ্রিল, দিন ৫৬

আকাশের ওই মেঘ থেকে বৃষ্টি নেমে এল এক পশলা। এ বোধহয় আমার বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থা পরখ করার জন্যে। আধ বোতলটাক জল ধরলাম। কিন্তু ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বুঝতে পারলাম দূষিত হয়ে গেছে জল। ভেলার ছাউনির কমলা রঙের কুচি মিশে গেছে জলের সঙ্গে।

বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থা আর একটু ভালো হবে আশা করেছিলাম, কিন্তু তা আর হল না। ছাউনির নোংরা জল পানীয় জল ধরার খাতে ঢুকে পড়েছে।

তবে জল একটু নোংরা বা দূষিত হলেও ফেলে দেওয়াটা ঠিক হবে না। এক কাজ করি—নোংরা জলের সঙ্গে ভালো জল মিশিয়ে নেওয়া যাক। ভাগ হবে পঞ্চাশ: পঞ্চাশ।

আকাশ বেশ মেঘলাই ছিল। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্য। রোদ্দুরে সোলার স্টিল চালু হল আবার। পরিস্রুত পানীয় জল জমতে লাগল স্টিলের ব্যাগে।

কিন্তু স্টিলের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। ফলে খাওয়ার জলের মধ্যে কিছু নুন থেকে যাচ্ছিল।

তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড। আচ্ছা, বৃষ্টির ওই নোংরা জল আর এই পরিস্রুত লোনা জল মিশিয়ে খেলে কেমন হয়! যেমন ভাবা তেমনই কাজ। তবে বেয়াড়া এই

www.BanglaBook.org

মিশ্রণের বিচ্ছিরি গন্ধ লাগছিল নাকে। ফেলে দেব? ন্না, এখন জলের এত বড়ো অপচয় করা ঠিক হবে না কিছুতেই। আমি নাক চেপে গলায় ঢেলে দিলাম পুরোটা। তরল পদার্থ কেমন যেন জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল নীচের দিকে।

পুয়ের্তো রিকোর কাছে 'স্ট্রেটাস' নামের একটা জাহাজ ছোট্ট একটা নৌকো ভাসতে দেখেছিল জলে। জাহাজের পক্ষ থেকে সে খবর জানানো হয় সমুদ্রতীরের রক্ষী-দফতরে। নৌকোটাকে দেখতে কেমন? প্রশ্নের উত্তরে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে সোলোর কোনও মিল নেই।

সেইদিনই বেলাশেষে কোস্টগার্ডরা আমার পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের 'অনুসন্ধানের' সব কাজ শেষ। ওরা অবশ্য স্ট্রেটাসের কোনও উল্লেখ করেনি।

আমার ভাই এড্ বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল রোজই। কিন্তু না, আমার কোনও খবর নেই। সরকারি সূত্র থেকে কোনওরকম খবর না পেয়ে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ছিল এড্। কী ব্যাপার? ওরা খবর জানাচ্ছে না কেন? নাকি অনুসন্ধানের কাজ চলছে না ভালোভাবে!

অস্থির হয়ে এড্ হাওয়াইয়ের ডেরা ছেড়ে উড়ে এল বোস্টনে বাবা-মায়ের কাছে। আমার আর এক ভাই বব্ও ছিল ওখানে। ওরা সবাই মিলেমিশে ঠিক করল, অনুসন্ধানের কাজ এবার থেকে ওরাই চালাবে।

রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না কিছুতেই। দূষিত ওই জল আমার অন্ত্রে ঠিক যেন একটা ভারী পাথরের মতো আটকে ছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, ঘামও হচ্ছে সেই সঙ্গে।

ঘাড় শক্ত হয়ে উঠেছে, চোয়াল কঠিন। গা গুলোচ্ছে, বমি-বমি ভাব। নাড়ির গতি দ্রুত, ঝিমঝিম করছে মাথা।

মাঝরাত্তিরে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল ঘামে। অসহ্য যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম। হায় ভগবান, নির্ঘাত বিষ খেয়েছি আমি!

বমি-বমি ভাব, দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। মুখের মধ্যে জিভটা ঠিক ব্যাঙের মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। আর সহ্য করতে পারছি না। মহামূল্যবান পানীয় জলের একটা ব্যাগ টেনে নিয়ে ঢাকনা খুলে ফেললাম একটানে। তারপর সেই জলের কিছুটা ঢকঢক করে ঢেলে দিলাম গলার মধ্যে।

গলার পথ আটকে বসেছিল ব্যাঙের মতো সেই জিভটা। কোনওমতে জিভ সরাতেই গলা বেয়ে নীচে নেমে গেল জল। পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে, এই জলে নিভবে কি না কে জানে!

আর-এক ঢোক জল খেলাম, তারপর আর-এক ঢোক। এইভাবে বেশ কিছুটা জল খাওয়ার পরে বমি-বমি ভাবটা কেটে গেল। একটু বাদে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকালে বেশ দুর্বল বোধ করছিলাম। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকারও কোনও উপায় নেই। খাবার জোগাড় করতে হবে। বহুক্ষণের চেষ্টায় আর একটা ট্রিগারফিশ ধরলাম। তারপর আমার ছোটোখাটো একটা খাদ্যভাণ্ডার গড়ে উঠল।

২ এপ্রিল, দিন ৫৭

সোলার স্টিল বিগড়ে গিয়েছিল কিছুটা, অনেক চেষ্টায় ওটা ঠিকঠাক করলাম আবার।

উত্তরমুখো হাওয়ায় ভেসে চলেছে ভেলা। কত অক্ষাংশে? ত্রিভুজের কায়দায় তিনটে পেনসিল বেঁধে একটা সেক্স্ট্যান্ট বানালাম। সেক্স্ট্যান্টে এমন কায়দায় আয়না লাগানো থাকে যে, এর সাহায্যে নাবিক একইসঙ্গে দিগন্তরেখা ও আকাশের নক্ষত্র দেখতে পায়। তবে আমার এই যন্ত্রটি একেবারে আদিমযুগের মতো। একইসঙ্গে আকাশের তারা ও দিগন্তরেখা দেখার উপায় নেই। সুতরাং মাথা ওপর-নীচ করতে হবে বারবার। প্রথমে একটি নক্ষত্র-বরাবর পেনসিল ধরো, তারপর ...। যাকগে, আজ রাত্তিরে যন্ত্রটি নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে একবার।

পরীক্ষা চালালাম। মোটামুটি দিকনির্ণয়ও হল। ঠিক আছে, এগিয়ে চলো ডাকি। এদিকে ডোরাডোর ঝাঁক সারাদিন ধরে আক্রমণ চালিয়ে গেল আমার ভেলার ওপর। জলের তলা দিয়ে ছুটে এসে কী সাঙঘাতিক সব ধাক্কা! দুর্বল, ক্ষতবিক্ষত শরীর; এই শরীরে ওই আঘাত সহ্য করা বেশ কঠিন!

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে আবার। রোদ্দুরে বেশ জোর, গরম লাগছিল খুব। হালকা বাতাসে ভেলা ভেসে যাচ্ছিল উত্তর দিকে। রাত্তিরে ঝকঝকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। ওই আলোয় শতখানেক ট্রিগারফিশ আর গোটাতিরিশেক ডোরাডো ভেলাটাকে গুঁতিয়ে গেল সামনে।

৩ এপ্রিল, দিন ৫৮

একটা চক্কর কেটে সকালের দিকে আবার আগের পথে চলতে লাগল ডাকি। আমার সেক্স্ট্যান্টের হিসেবে আমি সতেরো ডিগ্রি অক্ষাংশে। তবে ডিগ্রিখানেক এদিক-ওদিকও হতে পারে। ভুল পথে এক ডিগ্রি যাওয়ার অর্থ হল যাত্রাকাল মাসখানেকের মতো বেড়ে যাওয়া। চলার গতি অবশ্য সবসময় এক থাকবে, এমন আমি আশা করি না। একটু-আধটু সময় যদি নষ্ট হয়—হোক। আজকের দিনটা ধরলে ভেলায় আমার আটান্ন দিনের জীবন। তবে ধৈর্য ধরে লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে।

ডাকির গায়ে কয়েকটা তাপ্পি। তাপ্পি থেকে বুদবুদ উঠছিল। ডাকি যাতে চুপসে না যায় তার জন্যে ঘণ্টাদেড়ক পর-পর হাওয়া ভরছিলাম টিউবে। কপাল ভালো, বুদবুদ উঠলেও তাপ্পি খোলেনি। আর অবাক কাণ্ড, ওপরের চাইতে নীচের টিউব এখন ঢের বেশি শক্ত।

ভেলার নীচে ডোরাডোর ধাক্কা। গুঁতো খাওয়ার পরে ঝোঁক চাপল শিকারের। শিকার মানেই খাদ্য। তাক করে বর্শা ছুড়লাম, কিন্তু কোনও মাছের গায়ে লাগল না। একই খেলা

www.BanglaBook.org

চলল বহুক্ষণ ধরে। তারপর একটা মাছ ধরলাম। ভেলার ওপর ছটফট করছিল, ছুরি চালিয়ে বরাবরের জন্যে শান্ত করে দিলাম মাছটাকে। উপস্থিত খাদ্যের কোনও অভাব নেই আমার, কিন্তু অদ্ভুত এক যন্ত্রণাবোধও চেপে ধরেছিল আমাকে। যে মাছটা ভেলার পাশে ভাসতে ভাসতে এতক্ষণ ধরে সঙ্গ দিয়েছিল আমাকে— সে আর বেঁচে নেই!

বর্শার অবস্থা যাচ্ছেতাই। ভেঙে গেছে আবার। বর্শার হাল দেখে মনে হচ্ছে, মানুষ না হয়ে মাছ হয়ে জন্মানোই বোধহয় ভালো ছিল। এটা দিয়ে আর হয়তো শিকার করা যাবে না। মাখন কাটার ছুরিটাই এখন আমার সম্বল। কাঁটাটা আগেই ব্যবহার করা হয়ে গেছে। বড়ো ছুরিটা বড্ড ভারী। ওটা বর্শার ফলা হিসেবে কাজে লাগালে খুব একটা সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। যাকগে, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন মাখন কাটার ছুরিটাকে বরং বেঁধেটেধে ঠিকঠাক করে নেওয়া যাক।

রাত্রে বৃষ্টি নামল চেপে। বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থা আগেই ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম। পানীয় জলের সঙ্গে ভেলার ছাউনির নোংরা খুব একটা মিশল না। ছোটো বোতলের আড়াই বোতল জল ধরলাম আমি। তেষ্টার জল মজুত। আমার শেষ সোলার স্টিলটা এখন কাজ না করলেও ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই।

দুপুরবেলা বহু দূরে আর-একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। জাহাজ যাচ্ছে উত্তর দিকে। বাজি ছুড়ব আকাশে? না, কোনও লাভ হবে না। অত দূর থেকে জাহাজের কেউ এই বাজি দেখতে পাবে না। ফ্লের গানে মরচে ধরে গেছে, ওটায় আর কোনও কাজ হবে কি না কে জানে! যাই হোক, শেষ হাওয়াই বাজিটা এখন আমি আর ছুড়ব না।

ফ্লের গানের বদলে ভি এইচ এফ রেডিও এখন ঢের বেশি কাজে লাগত। রেডিওর সাহায্যে অতীতে বহুবার আমি জাহাজের রেডিও-অপারেটরদের সঙ্গে কথা বলেছি। আড়ালে থেকেই, কথা বলেছি অথচ জাহাজের লোকজনের চোখে পড়িনি।

দূরে ওই জাহাজটাকে এখন দেখতে পাওয়া সুলক্ষণ বলেই মনে হচ্ছে। জাহাজ চলাচলের পথটা সম্পর্কে আমি যা ভেবেছিলাম তা বোধহয় ঠিকই। ব্রাজিল আর ফ্লোরিডার এই পথে নির্ঘাত বহু জাহাজ চলাচল করে।

তবে, সমুদ্রের চেহারায় কোনও পরিবর্তন নেই। সমুদ্র আগের মতোই নীল ও সীমাহীন। অনেক উঁচুর আকাশে কয়েকটা ফ্রিগেট চক্কর কাটছিল।

অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম এই সময়। আমি যেন বাড়িতে। চারদিকে বসন্তের শান্ত, সুন্দর আবহাওয়া। গাছের কচি-কচি পাতা ঝকঝক করছে সূর্যের আলোয়। আমি আর আমার প্রাক্তন স্ত্রী ফ্রিশা একটা পাথরের দেওয়ালের ওপর বসেছিলাম। প্রতিবেশীদের উদ্দেশে হাত নাড়লাম আমি। তারপর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠে বললাম: আমি মারা যাচ্ছি।

ওরা নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করার জন্যে একটা দল পাঠাবে।

আমার ভাই এড আর বাবা কোস্ট গার্ডদের কাছ থেকে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করেছিল। আবহাওয়া সম্পর্কে বিস্তর তথ্য পেয়েছে নরফোক ওয়েদার সার্ভিস থেকে।

www.BanglaBook.org

সাহায্য চেয়ে কংগ্রেসের লোকজনের কাছেও চিঠি পাঠিয়েছিল ওরা। টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এডের আঙুলে ব্যথা হয়ে গেছে রীতিমত।

আবহাওয়ার খবরাখবর বিচার-বিশ্লেষণে বসে গিয়েছিল আমার বাড়ির সবাই। জানার কথা একটাই, সেটা হল : ঠিক কোন জায়গাটায় বিপদে পড়েছি আমি।

আমার ভাই কমার্শিয়াল ডাইভার এবং নাবিক হিসেবে সমুদ্রকে খুব ভালোভাবে জানে। আমার বাবা সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ মিশন চালিয়েছেন যুদ্ধের সময়। বেশ কয়েকজন পেশাদার নাবিক ও বন্ধু রহস্য সমাধানের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বিস্তর গবেষণা চালাবার পরে যে দুটো জায়গা বাছা হল, তার একটির মাত্র একশো মাইলের মধ্যে আমার অবস্থান। সত্যি, দারুণ অঙ্ক কষা হয়েছিল।

কোস্টগার্ডরা অবশ্য এ-ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। ওদের ধারণা তীরে পৌঁছবার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার এতদিন বাদে নিখোঁজ কোনও নাবিকের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। একজনই মাত্র বেঁচে ছিল। তবে সেটি নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম।

৪ এপ্রিল, দিন ৫৯

আমার সামনে শূন্য দিগন্ত, গত দু'মাস ধরে এই দৃশ্যই দেখে আসছি আমি। ভয়ংকর ক্লান্তিতে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, চোখের পাতাও নেমে আসছিল বারবার। ঠান্ডা আবহাওয়ায় সুস্থির থাকতে পারছিলাম না, বেয়াড়া তর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। ভেলার সবকিছুই মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের নুনে।

আমার শরীরে অনেকগুলো ক্ষত। ওইসব জায়গায় নুন লাগার জন্যে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছিল সর্বাঙ্গে। দুপুরের চড়া রোদে ভেলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া দূর হল, কিন্তু তখন আবার আর এক জ্বালা। শুকনো নুনে ছড়ে যাচ্ছিল ক্ষতগুলো। হাঁটু মুড়ে বসলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কতক্ষণ! মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। তীব্র তাপে জ্ঞানে হারালাম আমি।

চোখ বুজে ফেলাটাই সব চাইতে সহজ কাজ। চোখ বুজে থাকো তুমি। ব্যস, কিচ্ছু আর করার নেই। যা ঘটার তা ঘটে যাক নির্বিবাদে ... চুপ করো! নিজেকে ধমকালাম আমি। অলস চিন্তা ছেড়ে কাজে নেমে পড়ো এবার। নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে ভয়ংকরী মেরে ফেলবে তোমাকে। তারপর ঝুলিয়ে রাখবে তোমার গায়ের চামড়া। সেটা হবে তখন পাখির খাদ্য।

মাখন কাটা ছুরির অবস্থা খুবই খারাপ। এ দিয়ে কাজ আর চলবে কি না কে জানে! তবে উপায় নেই, ওটাকেই আবার আমি বর্শার মাথায় বেঁধে ফেললাম। বর্শার ফলা তেমন আর জোরালো হল না। তবে দেখা যাক কী হয়! প্রথমেই ছোটোখাটো একটা শিকার ধরার চেষ্টা করলাম আমি। কিছুক্ষণ কসরত করার পরে একটা ট্রিগারফিশ তুললাম ভেলায়।

www.BanglaBook.org

মনে হচ্ছে, ভয়ংকর এই যাত্রার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি আমি। কলম্বাসের মানসিক অবস্থাও বোধহয় এইরকমই ছিল। কূলহীন সমুদ্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য যাত্রা। নাবিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ; কিন্তু কলম্বাসের মনে হয়েছিল দিগন্তের ওপারেই আছে শক্ত মাটি। কিন্তু ওই ধারণা কিছুতেই আর সত্যি হচ্ছিল না। এক দিগন্তরেখার শেষে আবার ঠিক একই ধরনের আর-এক দিগন্তরেখা।

মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোর বুক ফ্যাকাশে-সাদা। নির্ঘাত ওগুলো ফ্রিগেট। ওদের দলে এসে ভিড়েছে আরও দুটো পাখি। ডানা ঝাপটাচ্ছে দুটো টার্ন। চিলের মতো চেহারা খয়েরি রঙের একটা পাখিকেও উড়ে যেতে দেখলাম জলের ওপর দিয়ে।

বিচিত্র এক বোধের শিকার হয়েছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল, কে যেন সঙ্গী হয়েছে আমার! তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আমার অদৃশ্য সঙ্গীটি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে: ভয় নেই। আমি সব দেখাশোনা করব।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে আমি এই অশরীরীর সঙ্গে কথাবার্তাও চালাতাম। সজাগ অবস্থায় বুঝতে পারতাম এমন কিছু ঘটা অসম্ভব, কিন্তু প্রগাঢ় বোধের জগতে যুক্তি-বুদ্ধির কোনও স্থান নেই। টের পাচ্ছিলাম আমার ক্লান্তি বিপজ্জনক এক সীমায় পৌঁছে গেছে। আমার অদৃশ্য সঙ্গী কেমন যেন ভরসা দেওয়ার গলায় বলল: তুমি বড়োজোর বিশে এপ্রিল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে।

ভেলায় আর টাটকা খাবার বলে কিছু নেই। সমুদ্র এখন আবার উত্তাল, এই অবস্থায় শিকার করা বেশ কঠিন। শুকনো মাছের কয়েকটা টুকরো কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজে থাকার ফলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

দিনের প্রথম আলো ফোটার মুখে হাতে বর্শা নিয়ে মাছ শিকারে নেমে পড়লাম আমি। তাক করি আর বর্শা ছুড়ি। বিরামহীন চেষ্টা। কিন্তু কোনও লাভ হল না। একটাও মাছ ধরতে পারলাম না।

শরীর অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাত যেন আর তুলতেই পারছি না। কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রম বিফলে গেল।

মাথার ওপরে সূর্য। হাত কাঁপছে থরথর করে। মনে হচ্ছে হাত দুটো খসে পড়বে এক্ষুনি। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম ভেজা ভেলার ওপর।

সন্ধেয় মাছ ধরার চেষ্টা করলাম আবার। পারলাম না। পরদিন সকালেও চেষ্টা চালালাম। না, এবারও ব্যর্থ হলাম।

এই আবহাওয়ায় জল ছাড়া তিন দিনের বেশি টিকে থাকা অসম্ভব। যা মজুত আছে তাতে কি দিনদশেক চলবে? সোলার স্টিলটাকে ঠিকঠাক করলাম। কিন্তু একটা মাছ এসে স্টিলের পানীয় জল জমানোর ব্যাগ ঠুকরে ফুটো করে দিল। চোখের সামনে জল নষ্ট হল বেশ কিছুটা। কিন্তু আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। কেমন যেন অসাড় হয়ে বসেছিলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৬ এপ্রিল, দিন ৬১

গত কয়েকদিন ধরে অতলান্তিকে অসীম শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হঠাৎ দেখি একটু দূরে ঢেউয়ের মাথায় শৈবালের মস্ত একটা টুকরো ভাসছে। ডাকি কাছাকাছি পৌঁছতেই ওই টুকরোটা তুলে নিলাম আমি। টুকরোর সঙ্গে উঠে এল ছোটোখাটো কিছু জলজ প্রাণী। মাছ ধরার একটা ছেঁড়া সুতো জড়িয়ে ছিল ওই শৈবালে।

একটু বাদে আর-একটা টুকরো পেলাম। তারপর আবার, আবার। ধীরে-ধীরে সামনের সমুদ্র ভরে গেল প্রচুর শৈবালে। ওইসব উদ্ভিদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অসংখ্য ছোটো-ছোটো চিংড়ি, কাঁকড়া আর কুচো মাছ। আমার খাবারের ভাঁড়ার তৈরি হতে লাগল ধীরে-ধীরে।

বিস্তীর্ণ এলাকা ধরে ছড়িয়ে-থাকা শৈবালের ওই টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে শরৎকালের কথা মনে পড়ে যায়। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের শুকনো পাতা যেন উড়ে পড়ছে নীচে।

শৈবালের সঙ্গে মিশেছিল আবর্জনা। গত ষাটদিন ধরে আমি যেন মহাসাগরের আদিম চেহারা দেখেছি। মানুষ বুঝি এই জগতে কখনও আসেনি। মাঝেমধ্যে অবশ্য দু-একটা জাহাজ দেখেছি, মানুষ যে এখনও বাস করে পৃথিবীতে— তার প্রমাণ ওই জাহাজগুলো।

হঠাৎই আমার চারদিকে রাশি-রাশি আবর্জনা দেখতে পেলাম।। পুরনো বোতল, ঝুড়ি, বাল্‌ব, ফ্লাস্‌ক, মাছ ধরার জালের টুকরো, দড়ি, ক্রেট, ফোম, বিবর্ণ কাপড়ের ফালি — কী নয়! আবর্জনার দীর্ঘ পথ চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কয়েক ঘণ্টা ধরে ডাকি আবর্জনার পাহাড় ঠেলে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

আমার সঙ্গী ট্রিগারফিশগুলো কেমন যেন খেপে গিয়েছিল। আবর্জনারাশির মধ্যে বিস্তর খাবারদাবার। এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়ে ওইসব খাবার খাচ্ছিল মাছগুলো। অবাক কাণ্ড, চারদিকের এই জঞ্জালের মধ্যে আমি বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। বিচিত্র এই পরিবেশের মধ্যেও প্রকৃতি তার ধাত্রীগৃহ অবারিত রেখেছে। আমাদের কাছে ক্ষয় মানেই মৃত্যু, কিন্তু প্রকৃতির কাছে তা আবার নবজন্মের সূচনা।

মহাসাগরের আবর্জনাস্তূপ থেকে চিংড়ি আর কাঁকড়া ধরে খাচ্ছিলাম আমি। নোংরার পাহাড় নতুন এক তাৎপর্য বয়ে এনেছিল আমার কাছে। বিচিত্র ব্যাপার, এই নোংরাই এখন বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে আমাকে।

আশপাশে নতুন সব পাখি আর মাছ দেখে বুঝতে পারছিলাম ভেলার বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আবর্জনার মস্ত এই পথটা বোধহয় কোনও কিছুর বিভাজন রেখা!

ধীরে-ধীরে রাত নেমে এল। ডাকি আগের মতোই আবর্জনা ঠেলে এগিয়ে চলেছিল সামনের দিকে। সকালে অবাক হয়ে দেখি জলের রং পালটে গেছে। জল এখন হালকা নীল আর বেশ স্বচ্ছ। আমি তা হলে নিশ্চয়ই অগভীর জলে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ আমি এখন ঠিক আমার নিয়তির মুখোমুখি।

www.BanglaBook.org

সেই ওলন্দাজ

৮ এপ্রিল, দিন ৬৩

সমুদ্রের চেহারা এখন বেশ স্বাভাবিক। পাঁচ-ছ'ফুট মাপের ঢেউ উঠছে আর ভাঙছে। ভেলা ভেসে চলেছে পশ্চিম দিকে। হাওয়ার গতি কুড়ি থেকে পঁচিশ নট। বেশ জোরালো বাতাস, তবে বিপজ্জনক নয়। কেমন যেন নিয়ম মেনে ঢেউয়ের মাথায় ওঠা-নামা করছিল রাবার ডাকি। ঢেউয়ের মাথায় ভেলা চাপলে আমি দূরের দৃশ্য দেখে নিচ্ছিলাম চট করে, কিন্তু আমার মগজ ঠাসা ছিল নানা ধরনের খাদ্য আর পানীয়র ছবিতে।

হঠাৎ দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। ভেলা থেকে জাহাজের দূরত্ব পাঁচ থেকে আট মাইলের মধ্যে। জাহাজ চলেছে পশ্চিম দিকে, উত্তর-পশ্চিমে। এই ভাবে চললে আরও কিছুটা কাছে চলে আসবে আমার। সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। সেই মুহূর্তটা আসতেই আমি আমার শেষ প্যারাসুটবাজি ছুড়ে দিলাম আকাশে।

এই বাজি ঝলমল করে রাতের আঁধারে। ওই উজ্জ্বলতা দিনের বেলায় আসা অসম্ভব, তবু বাড়তি কিছুটা আলো ফুটে উঠেছিল আকাশের একপাশে। কিন্তু কোনও লাভ হল না। সাত নম্বর জাহাজটা আমার সংকেত সাড়া না দিয়ে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

আমার ভাঁড়ারে আর তিনটেমাত্র বাজি আছে। এ তিনটেই আবার হাতবাজি। তবে এসব থাকা না-থাকা বোধহয় অর্থহীন। জাহাজ কোনওদিন হয়তো এই ভেলার ওপর দিয়েই ছুটে যাবে, কিন্তু দেখতে পাবে না আমাকে। দ্বীপে পৌঁছতে না পারলে আমার বাঁচার আশা নেই কোনও।

একটু ইতস্তত করে ভাঙাচোরা বর্শাটা তুলে নিলাম হাতে। কপাল ভালো, শিকার জুটল। একটা ডোরাডো ধরলাম আমি। তারপর যান্ত্রিক নিয়মে শেষ করলাম বাকি কাজটুকু। টুকরো-টুকরো করে মাছ কেটে দড়িতে গেঁথে ঝুলিয়ে রাখলাম।

আমার রকমসকম ঠিক যেন বর্বর মানুষের মতো। কিন্তু কী-ই বা করতে পারি আমি? আর তো কোনও উপায় নেই। এত মাছ সত্যিই মারতে চাই না! হে ঈশ্বর, দয়া করে এবার ডাঙায় ওঠার একটা ব্যবস্থা করে দাও আমাকে।

আচ্ছা, আমি সত্যি-সত্যি চলে গেলে কেমন লাগবে আমার এই মাছেদের? ওদের সঙ্গ ছাড়া আমিই-বা থাকব কেমন করে?

উপস্থিত খাদ্যের কোনও অভাব নেই আমাদের। যা মাছ আছে তাতে দিন-দুয়েক চলে যাবে দিব্যি। তার মানে দু'দিনের বিশ্রাম। তবে সত্যিকারের বিশ্রাম পাওয়া সম্ভব একমাত্র শক্ত জমিতে। তা কি পাব কখনও?

আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে হয়তো আত্মহত্যা করার কথা ভাবত! কিন্তু না, আমি এখন আর ও পথে ভাবব না; বিশেষ করে দীর্ঘ এই লড়াইয়ের শেষে। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত এই শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা আর তো সহ্য করতে পারছি না!

www.BanglaBook.org

সেক্স্ট্যান্টের সাহায্যে হিসেব নিলাম অক্ষাংশের। প্রায় আঠারো ডিগ্রি। কিন্তু এই হিসেবটা ঠিক কতখানি নিখুঁত? তবে এটা বুঝতে পারছিলাম; আরও দিন-কুড়ি আমার পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। উত্তর দিকে আরও কিছুটা ভেসে গেলে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনও আশা থাকবে না। বরাতজোরে হাওয়া অনুকূলে বইলে এগিয়ে যেতে পারব দক্ষিণে।

১০ এপ্রিল, দিন ৬৫

সকালে ডোরাডোর ঝাঁকটাকে আর দেখতে পেলাম না। সেই জায়গায় এসেছে অন্য একধরনের ট্রিগারফিশ।

লম্বা মাপের দুটো মাছ ভেলাটাকে গুঁতিয়ে যাচ্ছিল সমানে। এ-দুটোও ডোরাডো, তবে আগের ওই নীল ডোরাডোর তুলনায় আকারে ছোটো। ওদিকে, এক-দু ইঞ্চি মাপের একঝাঁক কালো মাছ ভেলার ঠিক আগে-আগে যাচ্ছিল।

বহু উঁচুতে তিনটে ফ্রিগেট পাখি। আকাশের গায়ে ওগুলো যেন সেঁটে আছে। একটু বাদে, তুষারশুভ্র একটা টার্নকে দেখতে পেলাম। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এইটুকু পাখি, অথচ প্রতি বছর এরা নাকি প্রবাসযাত্রায় এগারো হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয়!

হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে উড়ে এল ধূসর রঙের একটা পাখি। পাখিটা চক্র কেটে নেমে আসছে নীচের দিকে। ওড়ার ভঙ্গি অনেকটা বাজের মতো। এটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ থেকে উড়ে এসেছে। উড়ন্ত খাবারের একটা তাল বলে মনে হচ্ছিল পাখিটাকে।

উড়তে-উড়তে পাখিটা আমার ভেলার দিকে নেমে আসছিল। তার মানে ভেলার ওপরে বিশ্রাম নিতে চায় কিছুক্ষণ। আমি সরে গেলাম আড়ালে। পাখিটা এখন অদৃশ্য, কিন্তু ভেলার ছাউনির ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল পরিষ্কার।

পাখি বসেছে ভেলার ওপর। সারা শরীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল আমার, কিন্তু একটুও শব্দ না তুলে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম শিকারের দিকে। তারপর বিদ্যুৎগতিতে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলাম পাখির পা-দুটো। উদ্ধার পাওয়ার জন্যে ডানা ঝাপটাতে লাগল পাখিটা, সেইসঙ্গে ওর লম্বা, ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে লাগল আমার হাত। এবার আমি অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরলাম পাখিটাকে, তারপর এক ঝটকায় টেনে নিলাম ভেলার মধ্যে। বাকি কাজটাও সেরে ফেললাম দ্রুত। পাখির লম্বা গলায় জোরালো একটা মোচড় দিতেই ওটা স্থির হয়ে গেল বরাবরের জন্যে।

এত সুন্দর একটা পাখিকে মেরে ফেলার জন্যে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ... কী জাতের পাখি এটা?

পাখিটার চামড়া খুব শক্ত। পালকগুলো বেশ মজবুত, ডানা আর দেহের সঙ্গে এঁটে বসে আছে। রবার্টসনের একটা উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল আমার। এই ধরনের পাখির পালক ছাড়ানোর বদলে সরাসরি চামড়া ছাড়িয়ে ফেলাই ভালো। ছুরি দিয়ে পাখিটার গলা আর ডানা কেটে চামড়া ছাড়িয়ে নিলাম আমি। পাখির মাংস অন্যরকম দেখতে, এর সঙ্গে কাটা মাছের কোনও মিল নেই। তবে স্বাদে তফাত নেই খুব একটা।

www.BanglaBook.org

ভালোভাবে কাটাকুটি করার পরে মাছ আর মাংসের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বার করা বেশ কঠিন। হাড়, মাংস, মেটে ইত্যাদি আলাদা-আলাদা করে সাজিয়ে রাখলে সমুদ্রের মাছ আর আকাশের পাখি কেমন যেন একাকার হয়ে যায়। এইভাবে কাটাকুটি করলে ডাঙার স্তন্যপায়ী জীবদেহের অংশও অনায়াসে মিশে যাবে এদের সঙ্গে।

বিশ্রাম নিতে এসে আর ফেরেনি পাখিটা

পাখির পেটের মধ্যে পাঁচটা রূপোলি সার্ডিন পেলাম। মাছগুলো কি ডাঙার কাছ থেকে ধরা?

পাখির ডানার পালকগুলো দেখতে ভারি সুন্দর! এত সুন্দর যে ওগুলো ফেলে না দিয়ে গোল টিউবের মধ্যিখানে ঝুলিয়ে রাখলাম সযত্নে।

বড়ো মাপের নীল ডোরাডোর ঝাঁকটা সন্ধের মধ্যে ফিরে এল আবার। ঝাঁকে আছে গোটাপঞ্চাশেক মাছ। সবাই আমার সঙ্গী। সঙ্গীরা খুব একটা শান্তশিষ্ট নয়। কয়েকজন তো জব্বর সব গোঁত্তা মেরে চলেছিল ভেলায়।

www.BanglaBook.org

পরদিন সকালে আমার শিকারের কপাল খুলে গেল চট করে। দশ মিনিটের মধ্যে দু'বার মাত্র বর্শা ছুড়ে একটা মাছ তুলে আনলাম ভেলায়।

১২ এপ্রিল, দিন ৬৭

আজ ১২ এপ্রিল। ফ্রিশার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার আগে এই দিনটি আমরা বিবাহবার্ষিকী হিসেবে পালন করতাম। তবে সে এখন অনেক আগের কথা।

ভেলার ছাউনিতে একটা উড়ুক্কু মাছ এসে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ধরলাম ওটাকে। মাছ খেতে এখন আর ভালো লাগে না, বিশেষ করে ডোরাডো। তবে অন্য মাছে অল্পবিস্তর স্বাদ পাই, এই যেমন উড়ুক্কু মাছ। তবে অবাক কাণ্ড, বিস্তর মাছ খেলেও পেট কেমন যেন খালিই থেকে যায়!

আমার হিসেবমতো দিন-চারেক হল মহাদেশের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি আমি। আমার ছোট্ট চার্ট বলছে এই প্রান্তটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রায় ১২০ মাইল পূর্বে। সেক্স্ট্যান্ট সঠিক হলে একটু বাদেই সবুজ দ্বীপের চড়াই দেখতে পাব আমি। আমি পৌঁছচ্ছি তাহলে অ্যান্টিগুয়ায়, অর্থাৎ একেবারে গোড়ার দিকে যেটা ছিল আমার গন্তব্যস্থল। কিন্তু এ-সবই আন্দাজি হিসেব।

এই যে পেনসিলের বানানো ত্রিভুজ, এটা হয়তো যন্ত্র হিসেবে একেবারেই হাস্যকর। যে এলাকার কথা ভাবছি, প্রকৃতপক্ষে হয়তো সেই এলাকার কয়েকশো মাইল দূরে আমার অবস্থান। কিন্তু যতই অবিশ্বাসী হই না কেন, দিগন্তের মেঘমালার দিকে তাকিয়ে থাকছিলাম একদৃষ্টে। মেঘের কোনও আকৃতি কি স্থির হয়ে যেতে পারে না একসময়। স্থির আকার, অর্থাৎ ওটি মেঘ নয়, সত্যি সত্যি দ্বীপ।

আরও কয়েক রকমের পাখি চোখে পড়েছে ইতিমধ্যে। নতুন পাখি, নতুন মাছ, নতুন রঙের জল—আগের সেই শৈবালের আর কোনও চিহ্ন নেই এখন। এসব কি নতুন-কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে! আমার দুর্গম এই যাত্রা কি শেষ হতে যাচ্ছে তা হলে! পলকহীন চোখে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। ধীরে-ধীরে চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল আমার দৃষ্টি।

পুয়ের্তো রিকোর কাছাকাছি এলাকা থেকে একটা জাহাজ মিয়ামি উপকূল-রক্ষীদের জানিয়েছিল যে, ছোট্ট একটা সাদা নৌকো চোখে পড়েছে তাদের। মাস্তুল-ভাঙা নৌকোটা ভেসে যাচ্ছিল জলে। নৌকো সম্পর্কে জাহাজের কাছে আরও খোঁজখবর চেয়েছিল রক্ষীবাহিনী। কিন্তু সেটা ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় বিস্তারিত খোঁজখবর দিতে পারেনি জাহাজ। বর্ণনা? বর্ণনা বলতে নৌকোর রং সাদা।। ফুট-বিশেক লম্বা। নৌকোর গায়ে কোনও চিহ্নটিহ্ন নেই। এবং কাউকেই দেখা যায়নি নৌকোয়।

কিন্তু সোলোর চেহারা অন্যরকম। সোলোর ওপর দিকে গাঢ় নীল রঙের ডোরাকাটা দাগ। নৌকোর গায়ে বড়ো-বড়ো হরফে নাম লেখা আছে সোলোর। কেবিনের দিকেও গাঢ় নীল রং। ডেকের সব দিকে বেশ বড়ো আকারে লেখা আছে ৫৭ সংখ্যাটি।

www.BanglaBook.org

ঘটনাচক্রে এই দুটি নৌকোই এক হয়ে গিয়েছিল। সরকারি ভাবে জানানো হল : নাপোলেয়ঁ সোলোকে দেখা গেছে, তবে ওই নৌকোয় কাউকে দেখা যায়নি। লং বিচ কোস্ট গার্ডের কাছ থেকে পাওয়া এই বার্তাটি ক্যালিফোর্নিয়ার একজন অপারেটর প্রচার করে আবার। বার্তাটি ক্রমে-ক্রমে পৌঁছে যায় বহু দূরে। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেছে সোলোর।

খবরটা কানে আসার পরে আমার ভাই আরও অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিল। যেমন, প্রাণ বাঁচাবার ভেলাটিকে কি নৌকোর ওপরে দেখা গেছে? অন্য কোনও জিনিসপত্র দেখা গেছে কি? জলদস্যুদের কবলে পড়ার কোনও চিহ্ন আছে কি সোলোয়? ভাঙা নৌকো দেখা গেছে ঠিক কোন জায়গায়? আমার ভাই নিজে গিয়ে দেখতে চেয়েছিল সবকিছু। কিন্তু দি নিউ ইয়র্ক কোস্ট গার্ড এসব প্রশ্নের কোনও উত্তরই দিতে পারেনি।

ওদিকে, আসল ঘটনা তো একেবারেই অন্যরকম। আমি যখন সমুদ্রে হাত ডুবিয়ে সঙ্গী মাছগুলোর গায়ে আদরের টোকা মারছিলাম, আমার মা তখন দুঃস্বপ্ন দেখে যাচ্ছিলেন একটার পর একটা। ভাবছিলেন, জলদস্যুরা নির্ঘাত খুন করে ফেলেছে ছেলেকে। কিংবা ফ্যাসিস্টদের কারাগারে পচছে সে।

আমার বাড়ির সবাই খুব অসহায় বোধ করছিল। কী-ই বা করার আছে তাদের! সাহায্যের আশায় রাজনৈতিক নেতাদের চিঠিপত্র দিয়ে যাচ্ছিল মাঝে-মধ্যে, আর যোগাযোগ রাখছিল জাহাজ-কোম্পানিগুলোর সঙ্গে। তবে এইসব কাজ বেশিরভাগ লোকজনের কাছেই ছিল অর্থহীন। তারা ধরে নিয়েছিল, বহু আগেই মারা গিয়েছি আমি।

আশা ছাড়েনি শুধু আমার বাবা-মা। তাঁরা ঠিক করেছিলেন অনুসন্ধানের কাজ মাস-ছয়েক টানা না চালিয়ে থামবেন না। আমার ভাই এড হাওয়াইতে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। আর কিছুই তো করার নেই। এখন শুধু প্রতীক্ষার পালা।

২০ এপ্রিল উপকূল-রক্ষীদের পক্ষ থেকে ছোট্ট একটি বেতারবার্তা আবার এক সপ্তাহ ধরে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বার্তাটি হল : সোলোর তীরে ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকদিন।

১৬ এপ্রিল, দিন ৭১

দিন যেন আর ফুরোতেই চাইছে না। আমি আরও ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। হিসেবমতো কয়েকদিন আগেই তো দ্বীপে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল আমার। পশ্চিম দিক থেকে বেশ কিছু পাখি এখনও উড়ে আসছে এদিকে। 'এপির্‌ব' শেষবারের মতো কখন আমি ব্যবহার করব? দ্বীপের কাছাকাছি এসে গেলে ক্যারিবিয়ানের কোনও বিমানে আমার সংকেত পৌঁছে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ডাঙা চোখে না পড়া পর্যন্ত বোধহয় অপেক্ষা করা উচিত!

www.BanglaBook.org

আমার এখন যা অবস্থা, সব কিছুকেই সন্দেহ করছি আমি। এই সন্দেহের হাত থেকে আমার অবস্থান, আমার বোধ, আমার জীবন —কিছুই রেহাই পাচ্ছিল না। আমি বোধহয় অভিশপ্ত প্রমিথিউস— আমার যকৃৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় রোজ, আবার তা নতুন করে গজিয়ে ওঠে প্রতি রাতেই। কিংবা আমি সেই ওলন্দাজ, ভয়ংকর এক অভিশাপ যাকে চিরকালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে। এই যাত্রায় বিশ্রাম বলে কিছু নেই। আমার সঙ্গে সেই ওলন্দাজের কোনও তফাত নেই বোধহয়। এইভাবে যেতে-যেতে আমি হয়তো একদিন আমার গোটা শরীরটা পচে যেতে দেখব! সম্বল বলতে যা-কিছু আছে ধ্বংস হয়ে যাবে চোখের সামনে।

শেষ সোলার স্টিলটা নষ্ট হয়ে গেছে একদম। তবে আমার জলের সংগ্রহ ভালোই। কিন্তু এই জল শেষ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। তারপর ভরসা বলতে শুধুই বৃষ্টির জল।

১৮ এপ্রিল, দিন ৭৩

ডাঙার কাছাকাছি পৌঁছেছি কি না বোঝার চেষ্টা করছিলাম বারবার। পেল্লায় চেহারারা সঙ্গী ডোরাডোরা উধাও হয়ে গেছে। পাঁচ-দশ পাউন্ডের একটা খয়েরি মাছ গত দুদিন ধরে ডাকির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাছটাকে মারার চেষ্টা করেছি বহুবার, কিন্তু সফল হইনি।

আকাশে পাখির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, কয়েকটা ফ্রিগেট চক্র কাটছিল মাথার ওপর। ইতিমধ্যে দুটো টার্ন ধরেছি আমি। দুটো পাখিই সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ভেলার ওপরে নেমেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে বরাবরের জন্যেই বিশ্রাম নিতে হয়েছে ওদের।

রাতের বেলায় আর একটা জাহাজ দেখতে পেলাম, কিন্তু ওটা ছিল বহু দূরে। তবে এসব আমার হতাশা দূর করতে পারছিল না একটুও। আমি নির্ঘাত সেই অভিশপ্ত ওলন্দাজ। ঘুমে চোখ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু ঘুমোবার উপায় নেই। শুধু পরিশ্রম, আরও বেশি পরিশ্রম। অনন্তকাল কি এইভাবেই চলবে?

গুহামানব আর আমার অস্ত্রের মধ্যে কোনও তফাত নেই বোধহয়। আদিম যুগের ওই অস্ত্র দিয়ে মাছ মারার চেষ্টা করলাম আবার, কিন্তু কোনও লাভ হল না। হাত-পা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছিল যেন। এই শরীরে শিকার করা অসম্ভব ব্যাপার!

গত আড়াই মাস ধরে ঠিক একই নিয়মে বেঁচে আছি আমি। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙে ততবারই চারদিক দেখে নিই ভালো করে। দিনের বেলায় প্রতি আধঘণ্টা অন্তর চারপাশে চোখ ঘোরাই। সব মিলিয়ে দু-হাজারেরও বেশি বার বোধহয় এইভাবে মাথা ঘুরিয়ে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছি আমি। ঢেউ কখন ওঠে, কখন ভাঙে; ঢেউয়ের মাথায় চেপে কখন তাকাতে হবে দূরের দিকে—সবকিছু আমি এখন বোধহয় স্রেফ বোধের সাহায্যেই বুঝতে পারি।

আজ দুপুরে একটা জাহাজ দেখতে পেলাম উত্তর দিকে। দিনের বেলায় হাতবাজির আভা দূর থেকে চোখে পড়া কঠিন। তবু ধোঁয়াবাজি জ্বালালাম একটা। উজ্জ্বল কমলা

www.BanglaBook.org

রঙের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিন্তু না, এবারও জাহাজের চোখে পড়লাম না আমি। জাহাজ মিলিয়ে গেল ধীরে-ধীরে।

১৯ এপ্রিল, দিন ৭৪

নষ্ট সোলার স্টিলটাকে কাজে লাগিয়ে পানীয় জল সংগ্রহের নতুন একটা পাত্র বানালাম দেড়দিন ধরে। বাহ্! দিব্যি হয়েছে! এখন শুধু একপশলা বৃষ্টি দরকার। বৃষ্টির জল জমা পড়বে ওই পাত্রে। জোর বৃষ্টি হয়ে গেলে গ্যালনখানেক জল জমে যেতে পারে।

দিগন্তরেখা এবং আকাশের দিকে চেয়েছিলাম আমি। চাইছিলাম কিছু-একটা ঘটুক। কিন্তু কিছুই ঘটছে না। অপেক্ষা করে-করে এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত।

২০ এপ্রিল, দিন ৭৫

আজ ২০ এপ্রিল, এই ভেলায় ৭৫ দিনে পা দিলাম আমি। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েছে কিছুক্ষণ। বৃষ্টি আর সমুদ্রের নুনে ডোরাডোর স্টিকগুলো কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, প্রথম দিকের ডোরাডোর কয়েকটা স্টিক বেশ ভালোই আছে এখনও!

সন্ধের মুখে পুবের বেশ কয়েক খণ্ড কালো মেঘ দেখতে পেলাম। যেদিকে যাচ্ছি তার সামান্য দক্ষিণে ভেসে যাচ্ছিল ওই মেঘের টুকরোগুলো। আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম ওইসব টুকরো ভেসে আসুক আমার মাথার ওপর, তারপর বৃষ্টি নামুক অঝোরে। কিন্তু আমার প্রত্যাশা পূর্ণ হল না, সব মেঘ উড়ে গেল মাইলখানেক দূরে। তারপর জোর বৃষ্টি নামল ওখানে।

চার পশলা বৃষ্টি। এত জোরে বৃষ্টি পড়ছিল যে, পেছনের নীল আকাশ ঢেকে গিয়েছিল একদম। ইশ্! ওখানে যদি কোনওমতে পৌঁছতে পারতাম আমি!

তেষ্টায় মুখের ভেতরটা শুকনো, খটখটে হয়ে গিয়েছিল। একটু দূরে কী প্রবল বৃষ্টি, অথচ এখানে তার ছিটেফোঁটাও নেই। বৃষ্টির জল ধরার শূন্য পাত্রটা বাতাসে নড়ে যাচ্ছিল শুধু।

সন্ধের আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘ, তবে ওগুলো সব উড়ে যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি শুরু হল ঝিরঝির করে। মিহি সুতোর মতো বৃষ্টি। একে ঠিক বৃষ্টি বলা যায় না। তবে যত সামান্য পরিমাণেই হোক না কেন, লবণহীন জল দেখলে আনন্দে নেচে উঠি আমি। প্লাস্টিকের বালতি ঘণ্টা-দুয়েক ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করলাম। সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়াল ছোটো বোতলের দেড় বোতল মাত্র।

ঢেউয়ের আকার খুব একটা বড়ো নয়। এমন ঢেউয়ে ডুববে না ভেলা। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, এই শরীরে নিশ্চিন্ত ঘুম অসম্ভব। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পরে ঘুমোই, তবে সে-ঘুমের মেয়াদ ঘণ্টাখানেকের বেশি নয়। কোনও ঘায়ে বেকায়দায় খোঁচা লেগে গেলেই কঁকিয়ে উঠি। ফের ঘুমনো তখন দূরের ব্যাপার, ওই কষ্ট ভুলতে সময় লেগে যায় অনেকটা।

www.BanglaBook.org

ঘুম ভাঙলে সমুদ্রের কালো জলের দিকে তাকাই। ঢেউ ভেঙে পড়ার সময় ফসফরাসের আলোর রেখা দেখা যায়। মাছের ঝাঁকও চোখে পড়ে। আজ কিন্তু অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম আমি। দক্ষিণপ্রান্তে মৃদু আলো। আলো উত্তর দিকেও। মাছ ধরার জাহাজ? ন্‌না, তা তো নয়। আলোর টুকরো দুটো নড়ছে না একটুও। হায় ভগবান, ওগুলো তাহলে জাহাজ নয়। রাত্রের মায়ায় নির্ঘাত ডাঙার ছবি ভেসে উঠেছে চোখের সামনে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম আমি। সঙ্গে-সঙ্গে আলোর একটি রেখা চোখে পড়ল একধারে। কী ওটা! আলোর রেখাটি একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত ঘুরে গেল। তারপর আবার একই ভঙ্গিতে ওপাশ থেকে এপাশে। লাফিয়ে উঠলাম আমি — বাতিঘরের আলো ওটা! অর্থাৎ সামনেই ডাঙা। 'ল্যান্ড হো' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। তারপর মনের আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিলাম।

আহ্! এর চাইতে বড়ো ঘটনা আর কী-ই বা ঘটতে পারে! মনের আনন্দে আমি দু-বোতল জল খেয়ে ফেললাম ঢকঢক করে। কিন্তু এটা মায়া বা মতিভ্রম নয় তো!

চিমটি কাটলাম নিজের গায়ে। উফ্! খাওয়ার জল আমার ঠোঁট ভিজিয়ে গলা বেয়ে নেমে গেছে — ওটাও তো আর স্বপ্ন হতে পারে না! না, স্বপ্ন নয়, সত্যি। আনন্দে আর একবার নেচে নিলাম আমি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে; এবার একটু শান্ত হও তো। তুমি এখনও ফিরতে পারোনি শক্ত জমিতে! কিন্তু ওটা কোথাকার বাতিঘর? 'অ্যান্টিগুয়া' শব্দটি এই মুহূর্তে কেমন যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছিল! এখন তুমি উত্তরে না দক্ষিণে?

দু-পাশের দুই আলোর বিন্দুর মধ্যিখানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল ডাকি। আরো কিছুটা এগোতে পারলে প্যাডল করব আমি, কিংবা ...। ডাঙার কাছাকাছি পৌঁছবার পরে এপির্‌ব্ চালু করব, ওই বার্তায় সাহায্য আসবে নিশ্চয়ই। কাল সূর্য ওঠার পরেই যন্ত্রটির সুইচ অন করতে হবে।

এখন ঘুমনো বোধহয় অসম্ভব। মাঝেমধ্যে শুধু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকছিলাম। ঝিমুনি কাটলেই চোখ বড়ো-বড়ো করে চাইছিলাম সামনের দিকে। বারবার বোঝার চেষ্টা করছিলাম —অস্বাভাবিক দীর্ঘ কোনও স্বপ্নের জগতে বাস করছি না তো!

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটাবার পরে সামনের আকাশে আলোর রেখা ফুটে উঠল। সকাল হচ্ছে। সকালের আলো আর একটু স্পষ্ট হলে দিগন্তরেখায় নিশ্চয়ই কোনও দ্বীপের আভাস দেখতে পাব। কিন্তু দিনের বেলায় প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে দ্বীপে পৌঁছনো বিপজ্জনক! তার চাইতে বরং কাল রাত্তিরে ... । দাঁড়াও-দাঁড়াও, এক্ষুনি অতশত ভেবে নিও না। চুপ করে বোসো তো!

২১ এপ্রিল, দিন ৭৬

ভোর হয়েছে, এই ভেলায় আজ আমি ৭৬ দিনে পা দিলাম। সামনের অপরূপ ওই দৃশ্যটি কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দিগন্তরেখা ছেয়ে আছে গাঢ় সবুজে।

www.BanglaBook.org

দিনের পর দিন আমি শুধু নীল আকাশ, নীল মাছ আর নীল সমুদ্র দেখেছি; এইসব নীলের মধ্যে গাঢ় ওই সবুজ কী অসম্ভব তৃপ্তিদায়ক!

যা ভেবেছিলাম দ্বীপটি কিন্তু তেমন নয়। আমার দক্ষিণে ইডেনের মতো সবুজ পাহাড়ি দ্বীপ, সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। দ্বীপের বাকি অংশ অবশ্য সটান উঠে গেছে মেঘের দিকে। উত্তরে খাড়াই পাহাড়। দ্বীপের মাঝখানের কিছু অংশ সমতলগোছের এবং চোখজুড়নো সবুজে ভর্তি। দ্বীপের এই মধ্যবর্তী এলাকা থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে আছি আমি।

উত্তরে খাড়াই সব পাথরের ওপর প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছিল অতলান্তিকের জলরাশি। সমুদ্রের ফেনায় ঢেকে যাচ্ছিল ওই দিকটা। দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকা এক জায়গায় ঢালু হয়ে গিয়ে দীর্ঘ সাগরবেলায় মিশেছে। ওখানে সাদা রঙের কয়েকটি বাড়ি, লোকজন থাকে বোধহয়।

দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি আমি, কিন্তু আমার অবস্থা একেবারেই নিরাপদ নয়। দ্বীপের উত্তর দিকে গেলে তীক্ষ্ণমুখ খাড়াই পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দক্ষিণ দিকে গেলে তীরে পৌঁছবার পথে বেশ কিছু খাড়াই পাথরের সামনে পড়তে হতে পারে। যাকগে, যে ভাবেই হোক না কেন—আজ, সম্ভবত আজ বিকেলেই আমার এই সুদীর্ঘ যাত্রাটি শেষ হবে।

এপির্‌ব্‌ চালু করলাম আমি, তারপর 'মেডিক্যাল কিট' খুলে ফেললাম একটানে। চিকিৎসার ছোট্ট এই সরঞ্জামটি অতি কষ্টে জমিয়ে রেখেছিলাম এতদিন ধরে। জমিয়ে রাখার একটাই উদ্দেশ্য— চূড়ান্ত অবস্থায় ব্যবহার করব। বাক্স খুলে ক্রিম বার করলাম, তারপর শরীরের বিভিন্ন ক্ষতমুখে লাগিয়ে দিলাম ওটা।

দক্ষিণ দিক দিয়ে দ্বীপে পৌঁছবার চেষ্টা করব প্রথমে। না পারলে অন্য দিক। সে-ক্ষেত্রে খাড়াই ধারালো ওইসব পাথরের আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে আগে থেকেই কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। ফোম-কুশনটা কাঁধে বেঁধে নেব আচ্ছা করে। ওই কুশন শুধু আঘাত থেকেই বাঁচাবে না আমাকে, জলে ভেসে থাকতেও সাহায্য করবে অনেকখানি।

রাবার ডাকির ছাউনিটা কেটে দেব। কাটার কারণ, পাথরের ওপর প্রচণ্ড জোরে ভেলা আছড়ে পড়লে ওই ছাউনিতে চাপা পড়ে যেতে পারি আমি। ছাউনির কাপড় বরং টুকরো-টুকরো করে কেটে নিয়ে হাতে-পায়ে জড়িয়ে নেব ভালো করে। হাত-পায়ের ব্যান্ডেজ আঘাত থেকে কিছুটা অন্তত বাঁচাবে আমাকে।

ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিল আমার ভেলা। ভেলা যত এগোচ্ছিল বহুদূরের একটা শব্দ তত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। র‍্যার্‌র্‌র্‌ ... র‍্যার্‌র্‌র্‌। শব্দ আর একটু জোরালো হতেই বুঝতে পারলাম ওটা ইঞ্জিনের শব্দ। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মাত্র শ-দুয়েক গজ দূরে একটা সাদা নৌকো। এদিকেই আসছে। ছোটো, ফুট বিশেকের নৌকো। ঢেউ ঠেলে আরও কাছে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলাম, নৌকোয় তিনটে কালো মানুষ অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

www.BanglaBook.org

আমি লাফিয়ে উঠে হাত নাড়তে-নাড়তে চেঁচিয়ে উঠলাম— হ্যাল্‌লো। উত্তরে ওরাও হাত নাড়ল। আর ভয় নেই, এবার আমাকে দেখা গেছে। এর অর্থ, প্রাণে বেঁচে গেলাম আমি! অবিশ্বাস্য! সত্যি, এত বড়ো ঘটনাটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না আমি!

আমার ভয়ংকর যাত্রা তা হলে বোধহয় শেষই হয়ে গেল! খাড়াই পাথরগুলো ডিঙোনোর আর কোনও প্রয়োজন নেই। ব্যাকুল হয়ে উড়োজাহাজের অপেক্ষায় থাকারও দরকার নেই আর।

নৌকোর তিন যাত্রীর দুজনের গায়ের রং সোনালি মেহগনির মতো, আর একজন কুচকুচে কালো। ওরা বোধহয় আমারই বয়সি। আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল ওরা। চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বিচিত্র ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে। বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল ওরা, কিন্তু একটা বর্ণও পরিষ্কার হচ্ছিল না আমার কাছে। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। বড়ো কথা হল, মাসতিনেক বাদে আবার আমি মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি!

কাছাকাছি আসতেই ওদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম আমি। কিন্তু ওদের বিচিত্র ভাষার উত্তরে কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুটি ভাষা ব্যবহার করার পর জিজ্ঞেস করলাম, "এ দ্বীপটার নাম কী?"

আহ্, কপাল ভালো! ওরা এবার আমার প্রশ্নের অর্থ ধরতে পেরেছে। "গুয়াদলুপ, গুয়াদলুপ।" ফরাসি। কিন্তু এমন ফরাসি আমি জন্মেও শুনিনি! এটা তা হলে ক্রিয়োল! একটু পরেই বুঝতে পারি, পিজিন ফ্রেঞ্চ।

ওই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কালো মানুষটি ইংরেজি জানে। তবে ওর কথার মধ্যে আছে ক্যালিপসো বিট আর বেশ চড়া ক্যারিবিয়ান অ্যাকসেন্ট।

BanglaBook.org

আমাদের মধ্যে এখন মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান। ঢেউয়ের ওপরে মুখোমুখি ভাসছে ভেলা আর নৌকো। কয়েক মুহূর্ত কথাটথা বলা বন্ধ করে আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আসলে কেউই বোধহয় কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, "হোয়াচ্ ইউ ডুয়িং, ম্যান? হোয়াচ্ ইউ ওয়ান্ট?"

উত্তরে আমি বললাম, "আমি এইভাবে সমুদ্রে ভাসছি ছিয়াত্তর দিন ধরে।"

আমার উত্তর শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় করল, কথা বলল আগের সেই বিচিত্র ভাষায়। ওরা হয়তো ভেবেছিল আমি রাবার ডাকিতে চেপে ইউরোপ থেকে আসছি। নিছক একটা চমক ছাড়া আর কিছুই নয় এটা।

আমি হঠাৎই বেয়াড়া একটা প্রশ্ন করে বসলাম, "তোমাদের কাছে কোনও ফলটল আছে?"

"না, ওরকম কিছু নেই"— উত্তর দেওয়ার পরে ওরা বোধহয় বুঝতে পারছিল না আর কী বলা উচিত! কিছুক্ষণ থতোমতো খেয়ে থাকার পরে ওদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখন দ্বীপে যেতে চাও?"

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ- হ্যাঁ অবশ্যই যেতে চাই।" কিন্তু আমার মনের কথাটা মুখ থেকে বার হল না সেই মুহূর্তে। ঢেউয়ের মাথায় নৌকো নাচছে। আমার বর্তমান, অতীত আর নিকট-ভবিষ্যৎ কী অদ্ভুতভাবে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, আমার ভয়ংকর লড়াই শেষ হয়ে গেছে এখন। আমার মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে এই ধীবর-বন্ধুরা। সবচাইতে বড়ো উপহারটি এরাই এখন এগিয়ে দিয়েছে আমার দিকে: সে-উপহারের নাম 'জীবন।' গত আড়াই মাসের মধ্যে আমি বোধহয় এই প্রথম টের পেলাম যে, আমার অনুভূতি, শরীর আর মন এক সুতোয় বাঁধা।

মাথার ওপরে চক্র কাটছিল কয়েকটি ফ্রিগেট। মাঝেমধ্যে জলে ছোঁ মেরে মাছ তুলে নিচ্ছিল ঠোঁটে করে। পাখির ঝাঁক দেখে মাছের আশায় ধীবর-বন্ধুরা এখানে এসেছে। এসে মাছের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দেখেছে। তারপর এরাই এখন আমার মুক্তির দূত।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি: "আমাকে নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা করার কিচ্ছু নেই। প্রচুর পানীয় জল আছে আমার কাছে। আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব স্বচ্ছন্দে। তোমরা মনের সুখে মাছ ধরে নাও আগে। এখানে প্রচুর মাছ আছে, বড়ো-বড়ো মাছ। তোমরা মাছ ধরো।"

আমার কথামতো মাছ ধরার কাজে নেমে পড়ল ওরা। ছ'ইঞ্চি বঁড়শিতে রুপোলি মাছের টোপ গেঁথে জলে ফেলা হল। এক-আধটা নয়, একসঙ্গে অনেকগুলো। নৌকোর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টোপ গিলল মাছ। বিশাল একটা ডোরাডোকে টেনে তোলা হল নৌকোর ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল ওরা। ক্রিয়োলের বিচিত্র উচ্ছ্বাসে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। তারপর সেই উচ্ছ্বাস একটানা বহুক্ষণ ধরেই চলল। প্রচুর মাছ ধরছে ওরা।

খুব শান্তভাবে জলের পাত্র খুললাম আমি। আমার জমানো ঐশ্বর্যের ছোটো পাঁচটি পাত্র ঢেলে দিলাম গলায়। ভেলার পাশে জলের মধ্যে ধীরস্থির ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে কয়েকটা ডোরাডো। বন্ধু, এখান থেকেই এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে না যে, নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছ তোমরা! গরিব ওই তিনটে মানুষের হাতে কিছু পয়সাকড়ি এলে তোমরা নিশ্চয়ই অসুখী হবে না। তোমাদের মতো এত ভালো মাছ ওরা আর কখনও পাবে না।

অতীতের কিছু-কিছু রহস্য এখনও পর্যন্ত রহস্যই থেকে গেছে আমার কাছে। অবাক হয়ে ভাবি, বর্শা-বন্দুকটা কেন আমি ইমার্জেন্সি-ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম! সোলো আধ-ডুবন্ত অবস্থায় জলে ভেসেছিল বহুক্ষণ, না হলে আমি কি আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো বার করে আনতে পারতাম ওখান থেকে! শিকার করা যখন বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল তখন কি ডোরাডোরা স্বেচ্ছায় আরও কাছে এগিয়ে আসত? আমি আর আমার বর্শা অকেজো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাছদের রকমসকমও পালটে গিয়েছিল বোধহয়। ধরা দেওয়ার জন্যে ওরা কেমন যেন মুখিয়ে থাকত! আঠারোশো নটিকাল মাইল ভেসে থাকতে গেলে বিস্তর খাবারদাবারের প্রয়োজন। এতদিন ধরে সেই খাদ্য কেন ওরা আমাকে জোগান দিয়ে গিয়েছে ক্রমাগত!

www.BanglaBook.org

আমি জানি, ওরা মাছ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমি অতিসাধারণ এক মানুষ মাত্র। প্রকৃতি আমাদের যেমন চালায়, আমরা তেমনি চলি। যা করণীয় তাই করি শুধু। তবু হঠাৎ হঠাৎ বাঁধাধরা এই জীবনের মধ্যে অলৌকিক এক নকশা এসে হাজির হয়। আমি চেয়েছিলাম অসম্ভব কোনও কাণ্ড ঘটুক এবং আমার মাছেরা সেই কাণ্ডটি ঘটিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু ঘটেছে বোধহয়!

মনে হচ্ছিল, ডোরাডোরা স্বেচ্ছায় লাফ মেরে আমার ওই ধীবর-বন্ধুদের কোলের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। ওই দৃশ্য দেখে কেমন যেন ধন্য মনে হচ্ছিল নিজেকে। এত শান্তি, এত আনন্দ আমি বোধহয় আর কখনও পাইনি!

নৌকোর গায়ে নৌকোর নাম লেখা ছিল ছোটো হরফে। 'ক্লিমেন্স।' ক্লিমেন্স গর্জন করতে-করতে রাবার ডাকিকে পাক খেয়েই যাচ্ছিল। প্রায় প্রতি মিনিটেই মাছ উঠছিল নৌকোয়। মাছ ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নজর রেখেছিল আমার ওপরেও। আমি হাত নেড়ে জানিয়ে দিচ্ছিলাম — চিন্তার কোনও কারণ নেই, ভালো আছি আমি।

হঠাৎ ওরা ওদের নৌকোটাকে ভেলার কাছে নিয়ে এল। ক্লিমেন্স আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের একজন কাগজে মোড়া ছোট্ট একটা উপহার এগিয়ে দিল আমার দিকে। কাগজের মোড়ক খুলে দেখলাম অসাধারণ উপহার। চিনি-মেশানো নারকেলের ছোট্ট একটা তাল। ওপরদিকে লাল চিনি ছড়ানো। লাল! সাধারণ সব রঙকেও এখন অপার রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল আমার।

উপহারটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে মাছ ধরার জন্যে ওরা আবার একটু দূরে সরে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে একইসঙ্গে চিনি আর ফলের কথা ভাবা যায় না! একটুকরো নারকেল কামড়ে নিলাম আমি। জিভ ভরে গিয়েছিল জলে। একজন ভাস্কর যতখানি সতর্কতার সঙ্গে গ্রানাইটের ওপর ছেনি চালায়, আমিও ঠিক ততখানি সতর্কতার সঙ্গে নারকেলের ওই তাল থেকে ছোট্ট-ছোট্ট টুকরো কেটে নিচ্ছিলাম দাঁত দিয়ে। ধীরে ধীরে পুরোটাই খেয়ে ফেললাম।

ভেলার পাশে জলের নীচে ডোরাডোর ঝাঁক পাতলা হয়ে এসেছে। মাঝেমধ্যে ওরা কেমন যেন পালা করে বিদায় নিচ্ছিল আমার কাছ থেকে, তারপর বঁড়শিতে ঝোলানো টোপ গিলছিল।

সূর্য একটু-একটু করে মাথার ওপরে উঠে গিয়েছিল অনেকখানি। অসহ্য গরম, আর পারছি না আমি! এবার তোমরা দয়া করে মাছ ধরা বন্ধ করো।

আধঘণ্টাটাক বাদে ওরা ভেলার গায়ে নৌকো ভেড়াল। ভয়ংকর এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাচ্ছিলাম তা হলে! দুঃসহ যাত্রা শেষ হবে আর একটু বাদেই।

জীবন

ধীবর-বন্ধুরা অবশেষে ওদের নৌকোকে ডাকির ঠিক সামনে নিয়ে এল। আমি আমার ছোট্ট ব্যাগটা ওদের হাতে তুলে নিলাম। তারপর ওদের সাহায্যে ভেলা ছেড়ে উঠে

www.BanglaBook.org

পড়লাম নৌকোয়। কিন্তু ভালোভাবে দাঁড়াবার আগেই পিছলে পড়ে গেলাম নৌকোর খোলের ভেতরে।

খোল মাছে ভর্তি। মাছের মধ্যে আছে বেশ কিছু ডোরাডো, কয়েকটা কিং-ফিশ আর ব্যারাকুডা। মাছের ওপর বসে চোখ ঘোরালাম চারদিকে। আরে! ডোরাডোর প্রত্যেকেই তো আমার পুরনো সঙ্গী। এক-এক জনের সঙ্গে এক-এক ধরনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার।

একটু বাদে খোল ছেড়ে নৌকোর ওপরে উঠে এলাম আমি। শরীরে প্রয়োজনীয় মাংসের অনেকটাই এখন নেই। নৌকোর শক্ত পাটাতনের ওপরে বসতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। কিন্তু কোনও উপায় নেই, কাত হয়ে বসলাম কোনওমতে।

ধীবর-বন্ধুরা এবার ডাকিকে টেনে তুলল নৌকোর সামনের দিকে। রবারের ভেলার কোথায় কোথায় প্লাগ আছে দেখিয়ে দিলাম আমি। সেগুলো টানতেই তোড়ে জল বেরিয়ে এল অনেকটা। হাওয়া বেরিয়ে-যাওয়া ভেলাটাকে এখন কালো রঙের মস্ত এক অ্যামিবা বলে মনে হচ্ছে। আমার মতো ভেলাও এখন বোধহয় পুরোমাত্রায় বিশ্রাম চায়!

এই দ্বীপের নিজস্ব কায়দায় বুঝি 'টেক-অফ' করল নৌকো। পঁয়তাল্লিশ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন একচোট গাঁক-গাঁক করার পরে নৌকো ছুটতে শুরু করল তীরের দিকে।

একটা জিনিস এখন খুব অদ্ভুত ঠেকছিল আমার। তা হল—নৌকোর এই দ্রুতগতিতে ছুটে-যাওয়া। জল কেটে এগিয়ে চলেছিল নৌকো। পেছনে জলের দীর্ঘরেখা। জলের ওই রেখা অতলান্তিক থেকে ক্যারিবিয়ানের দিকে ছুটে চলেছে। উঁচু-উঁচু ঢেউগুলো এখন আর কোনও বাধা নয়। কী সহজে ওইসব ঢেউকে বশ মানাচ্ছিল ক্লিমেন্স!

এই ক্লিমেন্স নৌকোটা চেহারা-চরিত্রে একেবারে গেঁয়ো। মস্ত একটা লাঠিতে জড়ানো আছে একটুকরো ত্রিপল। ওটা নাকি পাল! তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে পাল টাঙানো হবে নৌকোয়। একপাশে পনেরো-গ্যালনের প্লাস্টিক জাগে 'রিজার্ভ' তেল।

ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কে তেল ফুরিয়ে এলে ওই রিজার্ভ তেল ঢালা হয়। ঢালার পদ্ধতিটি বিচিত্র। প্রথমে একটুকরো মরচে-ধরা লোহার রডের সাহায্যে প্লাস্টিক জাগের মুখটা খোলা হয়। তারপর নৌকোর ক্যাপ্টেন জুলে প্যাক জাগের মধ্যে একটা নল ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে তেল টানে। তেল উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওটা লাগিয়ে দেওয়া হয় ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কে। মুখের তেলটুকু ক্যাপ্টেন থু-থু করে ফেলে দেয় নৌকোর ওপর। তেল ভরার পরে নতুন উৎসাহে নৌকো ছোটানো হয় আবার।

জুলের ভাই জঁ লুই ঠিক আমার পাশেই বসেছিল। সব ভাইয়েরই নাক বেশ চোখা আর চোখ খুব উজ্জ্বল। মিশরীয়দের মতো চেহারা। জঁ লুইয়ের চুল ছোটো করে ছাঁটা, কিন্তু জুলের মাথাটা ঠিক যেন ঘন ঝোপ। জঁ লুইয়ের হাসি বেশ খোলামেলা, তবে ওর সামনের সারির কয়েকটা দাঁত না থাকার জন্য ওই হাসি হঠাৎই কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকার এক গহ্বরে। আমার নিজের হাসি বোধহয় একবারের জন্যেও থামেনি।

www.BanglaBook.org

পলিনাস উইলিয়ামস বসেছিল আমার ঠিক পেছনে। ওর চওড়া মাংসপেশীগুলো যেন চকচকে লোহা পিটিয়ে বানানো। গায়ের রং এত কালো যে অন্ধকারে ওকে বোধহয় দেখাই যাবে না। ও যখন কথা বলছিল তখন ওর সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠছিল। আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছিল পলিনাস। বাকি দু-জন নিজেদের মধ্যে গল্প করে যাচ্ছিল খটমটে ক্রিয়োলে। গল্পের বিষয়বস্তু নৌকোর ইঞ্জিন: পলিনাস আমাকে ভরসা দেওয়ার গলায় বলল, "এই তো এসে গেলাম, আর বড়ো জোর ঘণ্টাখানেকের পথ?"

ক্লিমেন্স নিজস্ব ভঙ্গিতে গাঁক-গাঁক করে ছুটে চলেছিল। পলিনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, "নৌকোর মুখোমুখি পাহাড়ি ওই দ্বীপটার নাম কী? এদিকে সমতল এলাকাটারই বা কী নাম?"

উত্তরে ও বলল, "দ্বীপের নাম গুয়াদলুপ। আর এটা হল মেরি গ্যালান্ট।"

বিকট শব্দ উঠছিল নৌকোর ইঞ্জিনে। পলিনাস ওই শব্দের ওপরে গলা তুলে জানাল, "তোমার কপাল খুব ভালো বলতে হবে। আমরা মেরি গ্যালান্টের পুব দিকে কখনও মাছ ধরতে যাই না। তোমার বরাত, আজকেই গিয়েছিলাম শুধু। ওদিকটায় এসে দেখি বহু দূরের আকাশে পাখির ঝাঁক উড়ছে। তার মানে বেশ গভীর সমুদ্রের ওপরে। আমরা অত দূরে মাছ ধরতে যাই না কখনও। কিন্তু কেন জানি না, আজ হঠাৎ মনে হল—গিয়ে দেখি তো একবার। ওদিকে এসে দেখি দূরে কী যেন একটা ভাসছে! কী? পিপে হতে পারে। তাই যদি হয়, ওর আশেপাশে ডোরাডোর ঝাঁক থাকতে পারে। কিন্তু কাছে এসে দেখি, ওটা পিপে নয়, তুমি!"

ক্লিমেন্সের স্টিয়ারিং জুলের হাতে। মেরি গ্যালান্টের কাছাকাছি এসে গিয়েছি আমরা। তীরের কাছে সুপ্রাচীন সব প্রবালের চূড়ার ওপর আছড়ে পড়ছিল বিরাট-বিরাট ঢেউ! ফেনায় ভরে গিয়েছিল চারদিক। পাথরের প্রকাণ্ড ওইসব চাঁইতে নির্ঘাত গর্ত আছে অনেকগুলো। প্রবল গর্জনের প্রতিধ্বনি উঠছিল ওখানে। কল্পনা করলাম, আমি আর আমার ডাকি ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছি ওই জায়গায়! তার পরেরটুকু ভয়ঙ্কর। বিশাল-বিশাল ঢেউ ধারালো পাথরের ওপর আছড়ে আছড়ে গুঁড়ো করে দিচ্ছে আমাদের।

গলা খুলে আমার খুব প্রিয় একটি গান গাইতে লাগলাম আমি। "সামারটাইম ..।" আহ্! এই মুহূর্তে বেঁচে থাকাটা কী সহজ! আমি আমার সেই উচ্ছল মাছগুলোর কথা ভাবলাম। ভাবলাম, দ্বীপের আখগাছগুলো এখন বেশ বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে। নিজেকে কী অসম্ভব খোলামেলা বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ইচ্ছে করলেই আমি এখন ডানা মেলে উড়ে যেতে পারি আকাশে!

গলা ছেড়ে গান গাইছিলাম, কিন্তু ক্লিমেন্সের ইঞ্জিনের উৎকট শব্দে সেই গান চাপা পড়ে যাচ্ছিল। জঁ লুই চমৎকারভাবে হেসে বলল ঃ বাহ্! তোমার গানের গলাটি তো বেশ!

খুব সম্ভবত কথাটা সত্যি নয়। তবে পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, আমি আর কখনও গানের কথা আর সুরের মধ্যে এতখানি ঢুকে পড়তে পারিনি! আহ্! বেঁচে থাকাটা এখন কী সহজ আর আনন্দের!

www.BanglaBook.org

দ্বীপের ফুল আর ঘাসের গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে সটান আমার নাকে ঢুকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি হয়তো আমার জীবনে এই প্রথম রং দেখছি, শব্দ শুনছি এবং মাটির ঘ্রাণ পাচ্ছি। আমার বোধহয় পুনর্জন্ম হয়েছে।

ভয়ংকর ওই যাত্রার আতঙ্ক আমাকে হয়তো তাড়া করে ফিরবে সারাজীবন। তবে তা পরের কথা। নতুন জীবনের আনন্দ আর উত্তেজনায় আমি এখন আত্মহারা হয়ে গিয়েছি। এ-সবই আবার সম্ভব হয়েছে এই মানুষগুলোর দয়ায়। সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর দিন ধরে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আমি টিকে ছিলাম কোনওমতে। স্টিভেন কালাহানের তো একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল!

সামনের এলাকার একটা অংশকে অবিকল অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো লাগছিল। বিচিত্র এক বৃত্তাকার মঞ্চ। নৌকো এগিয়ে চলেছে দ্বীপের পশ্চিমদিকে। সমুদ্র এদিকে তরঙ্গহীন, শান্ত, আলো আর রঙে সবকিছুই উজ্জ্বল আর উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। একটু বাদেই দীর্ঘ এক বেলাভূমি চোখে পড়ল। বেলাভূমির একপ্রান্তে ছোটো-ছোটো ঘরবাড়ি। তাল গাছ আর নানা ধরনের ঝাঁকড়া গাছের ছায়া পড়েছে ওইসব বাড়িতে। গ্রামটির নাম সেন্ট লুই।

কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের বাসিন্দাদের নজরে পড়ে গেলাম। থামওয়ালা মস্ত একটা ছাতের নীচে অনেক লোকজন, সবাই তাকাচ্ছে আমার দিকে। মাছের বেচা-কেনা চলছিল, কিন্তু নৌকো তীরের দিকে আর একটু এগোতেই থেমে গেল ব্যবসাপত্তর। সবাই তাকিয়ে আছে এই নৌকোর দিকে। সবার চোখেই বিস্ময়।

নৌকোর সামনের দিকে ঢাউস কালো রঙের ওই বস্তুটা কী? নৌকোর ওপরে বসে থাকা দাড়িওয়ালা, অস্থিচর্মসার সাদা লোকটাই বা কে? বুঝতে পারছিলাম তীরের ওই লোকজনের মনে এই দুটো প্রশ্নই বড়ো হয়ে উঠেছে। নৌকো যে জায়গাটায় ভিড়বে, অত্যুৎসাহী মানুষদের একটা ঝাঁক ছুটে এসেছিল সেখানে।

আমি পরম স্নেহের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী ওই ডোরাডোগুলোর দিকে আর একবার তাকালাম। ডোরাডোর সংখ্যা বারো, ট্রিগারফিশও আছে বারোটা। আর আছে চারটে উড়ুক্কু মাছ, তিনটে পাখি আর বেশ কিছু শামুক, গুগলি ও কাঁকড়া। সমুদ্রের এইসব অতুল ঐশ্বর্যই এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে।

ন'টা জাহাজ দেখতে পায়নি আমাকে। গোটাবারো হাঙর আমাকে একটুখানি চেখে চলে গেছে। বেঁচে থাকার কথাই ছিল না, তবু বেঁচে আছি আমি। কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। এমন দশা হয়েছিল বোধহয় সেই রাতে— যে-রাতে সোলো ডুবেছিল।

বহুদিন বাদে আনন্দ করার কারণ পাওয়া গেছে একটা, কিন্তু সেই আনন্দ প্রকাশ করার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। তীরের কাছে এসে দাঁড়াল ক্লিমেন্স। আমি ফিসফিস করে আমার সঙ্গী মাছদের বললাম, "ধন্যবাদ বন্ধুরা, ধন্যবাদ; বিদায়।"

নৌকোর কাছে বেশ কিছু লোক। ছুটে এসেছে হাসিখুশি বাচ্চারা। বিস্ময়ের চাপে চোখ বড়ো-বড়ো হয়ে গিয়েছিল ওদের।

www.BanglaBook.org

নৌকোর সামনেই শক্ত জমি। কিন্তু ওই জমিতে পা ঠেকাতেই কেঁপে উঠল সারা শরীর। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে! পায়ে জোর পাচ্ছি না একটুও। মাথা ঘুরছিল রীতিমতো। পড়ে যাওয়ার মুখে দু-জন সবল মানুষ দু-দিক থেকে চেপে ধরল আমার হাত। ওরা ধরতে গেলে শূন্যেই তুলে রেখেছিল আমাকে, আমার পা যেন নিয়মরক্ষার খাতিরে মাটি ছুঁয়েছিল শুধু। তারপর ওইভাবেই হেঁটে গেলাম সামনের দিকে।

ছোট্ট গাঁয়ের পথ। পথের ধারে টিনের বেড়া-দেওয়া ছোটোখাটো ঘর। মাঝেমধ্যে মুরগিরা ডানা তুলে সশব্দে ছুটে পথ পার হচ্ছিল। গাছের ছায়ায় হাঁটছিলাম আমি। ঠিক পেছনে উৎসাহী লোকজনের দল।

রাস্তার প্রথম বাঁকে বড়োসড়ো হলুদ রঙের একটা বাড়িতে নিয়ে আসা হল আমাকে। দ্বীপের বাসিন্দারা একটা ফোল্ডিং-চেয়ার এগিয়ে দিল বসার জন্যে। তারপর প্রায় এক-সঙ্গেই সবাই বিচিত্র ফরাসি আর ক্রিয়োলে কথা জুড়ে দিল। কথা মানে প্রশ্ন। একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার নাম জানিয়ে দিলাম। তারপরেই ওরা এখানে-সেখানে ফোন করা শুরু করে দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য জবাব দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম আমি।

বারান্দায় বসানো হয়েছে আমাকে। আমার চারদিকে শতখানেক মানুষ। ওদের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম আমি। এখনও সবকিছু অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। ভয়ংকর ওই যাত্রা তা হলে শেষ হল!

ওদের চোখগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বিস্ময়ের ঘোর ওদের এখনও কাটেনি। কারও চোখ বিস্ফারিত, কারও চোখে অসম্ভব কৌতূহল, কারও দৃষ্টিতে উদ্বেগ; কারও চোখ আবার সমবেদনায় কাতর। আমার নিজের চোখ জলে ভরে উঠছিল বারবার। চেষ্টা করেও আবেগ দমন করতে পারছিলাম না আমি।

বরফ-ঠান্ডা জিন্‌জার বিয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হল আমার দিকে। বিয়ারের বোতল শক্ত করে চেপে ধরলাম।

ভাবছিলাম, এরা তো আমাকে চেনে না। এমনকী, আমাদের ভাষাও এক নয়। আমার দুঃসহ নরক-যন্ত্রণার কথা এদের বলে বোঝানো অসম্ভব। তবু বারবার মনে হচ্ছে, আমরা পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য এক বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। এই মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকের কাছে জীবনের অর্থ একটাই। ওদের চোখের মণিতে আমার ভাগ্যের প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছিল। আমাদের চলার পথ আলাদা হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য এক। সেখানে আমরা সব অর্থেই অভিন্ন।

নিঃসঙ্গ মানুষ

একটু বাদে বারান্দার সামনে একটা ভক্সওয়াগেন ভ্যান এসে থামল। গাড়িতে একজন কনস্টেবল এবং তার কয়েকজন সঙ্গী। ওরা গাড়িতে তুলে নিল আমাকে। তারপর গাড়ি এগিয়ে চলল দ্বীপের ভেতর দিকে।

www.BanglaBook.org

আমার নতুন এই সঙ্গীদের সবাইকেই খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। প্রত্যেকেই কথা বলে যাচ্ছিল অনর্গল, কিন্তু ওদের কথা একটা বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না আমি।

আমার হাতে বিয়ারের বোতল। একজন থেকে-থেকেই ওই বোতলটা চটপট শেষ করে ফেলার জন্যে ইঙ্গিত করছিল আমাকে। ভালো কথা! কিন্তু ওকে আমি কী করে বোঝাব যে, গত বারো ঘণ্টায় আমি যে পরিমাণ জল খেয়েছি সেই পরিমাণ জল আমার ভেলা-জীবনে গোটা সপ্তাহেও খেতাম না।

আমি ইঙ্গিতে ওর কথার উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আস্তে আস্তে।" আমার কথায় সায় দিল মানুষটা। বিয়ারের ঠান্ডা, ভেজা-ভেজা বোতলটা হাতের মধ্যে রেখে দিতে বেশ লাগছিল আমার।

মেরি গ্যালান্টের রাস্তাঘাট খুব একটা উঁচু-নিচু নয়। এলাকাটিকে সমতলভূমিই বলা যেতে পারে। পথের ধারে বিশাল আখখেত। কাটা আখে বোঝাই কয়েকটা গোরুরগাড়িও চোখে পড়ল।

আমার অনুভব-শক্তি বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল অসম্ভব। ফুল বা শস্যের ঘ্রাণ নাকে এসে লাগছিল তীব্রভাবে। আমার স্নায়ুর প্রান্তগুলি বুঝি অলৌকিক কোনও উপায়ে অ্যাম্পলিফায়ারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, সবকিছুই গ্রহণ করছিলাম আমি প্রবলভাবে।

কিছুক্ষণ ছোটার পরে গাড়ি এসে দাঁড়াল গ্রান্ড বোর্গ হাসপাতালের সামনে। সাদা ইউনিফর্ম পরা কালো নার্সদের কেউ-কেউ আমাকে উঁকি মেরে দেখে চলে গেল। কেউ-কেউ একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে।

একটু বাদে একজন কর্কেশ ডাক্তার আমাদের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তারবাবু ইংরেজি জানেন। বললেন, "আমি ডক্টর ডেলানয়। আপনার কী কষ্ট হচ্ছে বলুন তো?"

এর সঠিক উত্তর কী হতে পারে? বললাম, "আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে।"

আমার ওই বিদঘুটে উত্তর শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বোধহয় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। বুঝতে পারছিল না কী করা উচিত আমাকে নিয়ে! শুধু এটা হয়তো বোঝা গিয়েছিল, আমি 'ইমার্জেন্সি কেস' নই।

ডাক্তারবাবুকে আমি আমার বৃত্তান্ত জানালাম। বললাম: টানা ছিয়াত্তর দিন ভেলায় চেপে সমুদ্রে ভেসেছি! খাওয়া-দাওয়া ধরতে গেলে কিছুই জোটেনি, শরীরে সব জল বোধহয় শুকিয়ে গেছে। আর অসম্ভব দুর্বল বোধ করছি এখন। ব্যস, এ-ছাড়া আর কোনও কষ্ট নেই আমার।

সব শুনে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেন ডাক্তারবাবু। স্ট্রেচার আনার নির্দেশ দেওয়া হল। স্ট্রেচারের আবার কী দরকার। কিন্তু আমার আপত্তি ধোপে টিকল না। স্ট্রেচারে শুয়ে দোতলায় উঠলাম। তবে সরু একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল বহনকারীরা। ওখান দিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে যাওয়া শক্ত! অনেক কষ্টে আমি আমার সঙ্গীদের বোঝালাম: এটুকু পথ হেঁটে যেতে কোনও কষ্ট হবে না আমার।

www.BanglaBook.org

কিন্তু কে জানত যে আমার পা-দুটো ইতিমধ্যেই 'সামুদ্রিক পা' হয়ে গেছে! ওই পা শক্ত ডাঙায় বোধহয় একেবারে অকেজো। সাহায্য করতে এগিয়ে এল সঙ্গীরা। ওদের কাঁধে ভর দিয়ে কোনওমতে হাসপাতালের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকলাম।

একটি শয্যায় বসিয়ে দেওয়া হল আমাকে। উলটো দিকের বিছানায় একজন বৃদ্ধ রুগি আমাকে দেখে সামান্য একটু উঠে বসলেন। ওঁর হাতে ইনট্রাভেনাস চলছে। আমাদের মধ্যে নিঃশব্দে ছোট্ট একটা হাসি বিনিময় হল।

একটু বাদে ডক্টর ডেলানয় এসে পরীক্ষা করলেন আমাকে। প্রশ্নের উত্তরে যা-যা জানাবার জানালাম আমি। আমার রক্তচাপ ঠিক আছে, তবে এই ক'দিনে কুড়ি কেজি খুইয়েছি। অর্থাৎ আমার মোট ওজনের এক-তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু কম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমাকে ইনট্রাভেনাস ফিডিংয়ে রাখা হবে। ওর সঙ্গে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্সও মিশিয়ে দেওয়া হবে যাতে ঘা-টাগুলো সেরে যায় চটপট।"

তারপর গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন ডাক্তারবাবু, "আপনার মতো অবস্থা হলে কেউই কিছুকাল খাওয়াদাওয়া চালাতে পারবে না স্বাভাবিকভাবে, অবশ্য ...।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে থামিয়ে দিলাম ওঁকে। অ্যাঁ! কী বলছেন আপনি!

"আসলে আপনার পেট তো শুকিয়ে গেছে একদম। এই অবস্থায় শক্ত কিছু খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে।"

উত্তরে মরিয়া হয়ে ওঁকে আমি নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম: আমি খুব দুবলাপাতলা হয়ে গিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমি তো ধরতে গেলে নিয়মিতভাবেই খাওয়াদাওয়া করেছি। কিছু ফিশ স্টিক এখনও ভেলায় পড়ে আছে, সঙ্গে থাকলে আপনাকে উপহার দিতে পারতাম। বিছানায় পড়ে থেকে গায়ে ছুঁচটুচ ফোটানো একেবারেই পছন্দ নয় আমার। "মুখ দিয়ে খেতে পারি কি না — একবার চেষ্টা করে দেখি না বরং।"

"ঠিক আছে, চেষ্টা করুন! আমরাও দেখি। তবে ওই সঙ্গে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বড়ি খেতে হবে।" কথাটা বলার পরে ওখান থেকে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু যাওয়ার পরেই একজন নার্স এল। গোলগাল মুখ আর অসম্ভব হাসিখুশি। গোলাপি গাল। ফরাসি বলে তড়বড় করে।

নার্স ওর গোল মুখ ছুঁচলো করে আমার গায়ের নোংরা টি-শার্টটা খুলে নিল, তারপর দু' আঙুলের ডগায় ওটা উঁচু করে তুলে ঘরের কোনায় নিয়ে গিয়ে ফেলল। অবাক কাণ্ড, শার্টের কোনও দুর্গন্ধ আমার নাকে কিন্তু লাগছিল না! তবে সুগন্ধ পাচ্ছিলাম, ওই সুগন্ধ আসছিল নার্সের পরিচ্ছন্ন পোশাক থেকে।

চিনেমাটির বড়ো একটা পাত্রে ঈষদুষ্ণ জল এনে নার্স আমাকে ধোয়াতে-মোছাতে বসে গেল। এই কাজটা ও সতর্কতার সঙ্গে করছিল, কিন্তু আমার শরীরে যে বিস্তর ক্ষত—। মাঝে-মধ্যে চোট লেগে যাচ্ছিল ওইসব ক্ষতস্থানে। কাজের সঙ্গে-সঙ্গে হাসিখুশি গলায় সমানে বকবকানি চালিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি। মাঝেমধ্যে অন্য নার্সরাও এসে যোগ

www.BanglaBook.org

দিচ্ছিল গল্পে। ঘরের বৃদ্ধ রুগিটি আর আমিও অংশ নিচ্ছিলাম ওই আড্ডায়। সত্যি, এত প্রাণবন্ত হাসপাতাল আমি আর কোথাও দেখিনি।

দীর্ঘ আড়াই মাস সমুদ্রে ভাসার পরে আবার ডাঙায় উঠেছি আমি। মরে যাওয়ার আর কোনও ভয় নেই এখন। কিছু করারও নেই। বিশ্রাম, শুধুই বিশ্রাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এখনও বোধহয় জলেই ভেসে আছি আমি।

নার্স তার কাজকর্ম সেরে চলে গেছে। ধপধপে বিছানায় এখন শুয়ে আছি আমি। ঠিক এই ধরনের অনুভূতি আগে কখনও হয়েছে কি না মনে করতে পারলাম না। তবে ভেবে নিলাম, আমি জন্মাবার পরে বোধহয় ঠিক এইরকমেরই একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই মুহূর্তে অবিকল একটি শিশুর মতোই অসহায় আমি। চারপাশে যা-কিছু ঘটছে সে-সবের তীব্রতম প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছিল আমার বোধের জগতে। দেখা, গন্ধ নেওয়া, স্পর্শ করা— এসবই যেন আমার জীবনে এই প্রথম। স্বর্গ তা হলে দেখছি এই পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে।

একটু বাদে অল্পবয়সি একটা লোক ট্রে-ভর্তি একগাদা খাবার এনে রাখল আমার সামনে। তারপর বড়ো মাপের একটা গ্লাসে জল ভরে দিল। প্রথমেই কেমন যেন অবিশ্বাসের চোখে আমি সবকিছুর দিকে তাকালাম। এক গ্লাস জল। কী তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু কত বড়ো সম্পদ! ট্রে-র ওপর আছে মস্ত একটুকরো ফরাসি রুটি, স্টাফ্‌ড স্কোয়াশ, অচেনা কিছু সবজি, রোস্ট বিফ, হ্যাম, আলু, আর এক কোনায় নুন-ছড়ানো মাছের একটা টুকরো। এত আয়োজন দেখে হাসি পেয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, কিন্তু আমি কিছুই ফেললাম না। সব খেলাম চেটেপুটে। ঘরে যারা ঢুকছিল তাদের সবাই কেমন যেন অবিশ্বাসীর চোখে শূন্য ওই ট্রে-র দিকে তাকাচ্ছিল বারবার।

খাওয়ার পরে অ্যান্টিবায়োটিকস দেওয়া হল আমাকে। তারপর বেশ কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ। ওরা বলল, "এখন আপনার ঘুমের দরকার।"

আহ্! ঘুম। এখন বোধহয় কয়েকটা দিন আমি টানা ঘুমোতে পারি ...।

হঠাৎ হুড়মুড় করে কয়েকজন ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপরেই আমাকে গাদা-গাদা প্রশ্ন করা শুরু করে দিল। কারা এরা? পুলিশ তো নয়। কেননা হাসপাতালে আসার সময় পুলিশের উর্দি আমি দেখেছি। এদের পোশাকআশাক অন্য ধরনের।

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম আমি। একটা লম্বা সাক্ষাৎকারের মধ্যিখানে খবর এল আমার ফোন এসেছে ওদিকের এক ডাক্তারবাবুর ঘরে। এই হাসপাতালে ফোনের সংখ্যা কম। আর্দালি আমাকে হুইলচেয়ারে চাপিয়ে নিয়ে গেল ফোন ধরাতে।

ফোন করেছেন মার্তিনিকের মার্কিন কনসাল মিঃ ডর। ভদ্রলোক এই দ্বীপে আমাকে স্বাগত জানাবার পরে বললেন, "পাসপোর্ট না থাকার জন্যে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাকে যে-কোনও ধরনের সাহায্য দেওয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত।"

আমার খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। ঘরে ফেরার পরে দেখি আরও কয়েকজন নতুন অতিথি। সবার মুখেই প্রশ্ন। প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার পরে বিদায় নিল সবাই। এখন বিশ্রাম। স্বপ্নের জগতে বিশ্রাম।

www.BanglaBook.org

ঘুম ভাঙল ঘণ্টা-দুয়েক বাদে। বেশ ঝরঝরে লাগছিল নিজেকে। একটু পরে এক ভদ্রলোক লাজুক মুখে আমার বিছানার এক ধারে এসে বসলেন। ভদ্রলোককে মিশরীয়দের মতো দেখতে। চোখে চোখ পড়তে লম্বা করে হাসলেন। একটু-আধটু ইংরেজি জানেন। বললেন, ওঁর নাম ম্যাথিয়াস। ওঁর একটা বেতার-কেন্দ্র আছে, আর আছে একটা হোটেল। হোটেলটা উনিই চালান। আমি ইচ্ছে করলেই ওঁর হোটেলে গিয়ে উঠতে পারি। তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সঙ্গে কী আছে বলুন তো?"

"আমার সঙ্গে? জিনিসপত্র?"

ভদ্রলোক আমার ব্যাগ আর নোংরা টি-শার্টটা দেখে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি আসছি।"

এমনভাবে বললেন, যেন না বললে আমি এখন যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে পারি! ভদ্রলোক উধাও হলেন ঘণ্টাখানেকের জন্যে।

উনি চলে যাওয়ার পরেই আমি বিছানায় উঠে বসলাম কোনওমতে। পায়ের কাছে রেলিং, সেটা ধরে মেঝের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। হাঁটু ভেঙে যাচ্ছিল, পায়ে তেমন জোরও পাচ্ছিলাম না। তবে, ওই অবস্থাতেই আমার ঘরের দ্বিতীয় রুগিটির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম আমি। কেউ কারও ভাষা খুব একটা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু প্রসন্ন মুখে কথা চালিয়ে যেতে আমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না।

ম্যাথিয়াস ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন আমার জন্যে অনেক-কিছু কেনাকাটা করে। সামনে বিচিত্র এক বর্ণবাহার। উপহারের মধ্যে আছে নীল প্যান্ট, টুকটুকে লাল শর্টস, স্যান্ডাল আর একটা টি-শার্ট। শার্টের ওপর থেরি গ্যালান্টের মানচিত্র। সঙ্গে এক বোতল কোলনও ছিল।

অচেনা এইসব মানুষের সহৃদয়তায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। এই মুহূর্তে এ-ঘরের বাইরে দ্বীপবাসীদের আরও অনেকেই বসে আছেন। সবাই দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। অথচ অবাক কাণ্ড, এঁদের কাউকেই আমি চিনি না। অপরিচিত মানুষজন আমার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করছিলেন যেন আমি তাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কোনও ভাই। বহুকাল বাদে ঘরে ফিরে এসেছি হঠাৎ।

বিছানার রেলিং ধরে মেঝের ওপর আরও অনেকবার দাঁড়িয়ে ছিলাম। এইভাবে দাঁড়াতে- দাঁড়াতে আত্মবিশ্বাস তৈরি হল কিছুটা। তারপর আমি হাঁটতে শুরু করলাম ঘরের দরজার দিকে। দরজা খোলাই ছিল। কিন্তু হাঁটতে সময় লাগছিল প্রচুর। এক-একটি পদক্ষেপে পাক্কা এক মিনিট। নার্সরা দেখছিল, তবে আমার উদ্যমে বাধা দিচ্ছিল না কেউই। ভাগ্যিস বন্ধ, অ্যান্টিসেপটিক কোনও মার্কিন হাসপাতালে থাকতে হয়নি আমাকে।

এখানে পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশেও কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। আমার সম্বল বলতে ইঙ্গিতের ভাষা। সেই সঙ্গে একটু ফরাসি, একটু ইংরেজি— তাতেই কাজ চলে যাচ্ছিল দিব্যি।

সন্ধের দিকে হাওয়া বেশ ঠান্ডা হয়ে এল। ক্লান্ত বোধ করছিলাম, কিন্তু বেরোব বলে তৈরি হয়ে নিলাম চটপট। এই হাসপাতালের অ্যানাসথেটিস্ট মিশেল মঁতেরনো আজ

www.BanglaBook.org

রাত্তিরে ওঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করেছেন আমাকে, যদিও ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি এখনও।

একটু বাদে ম্যাথিয়াস এলেন। ওঁর সঙ্গে দুজন অল্পবয়সি ফরাসি ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। দুই ভদ্রলোকের একজন অঁদ্রে মঁতেরনো, ওই অ্যানাসথেটিস্টের স্বামী। বাকি দুজন মিশেল আর তাঁর বান্ধবী নানু।

ওঁরা ওঁদের সঙ্গে মস্ত একটা পিকনিক বাসকেট এনেছিলেন। সেটা খাবারদাবারে ঠাসা। আমার যদি বেরোবার ক্ষমতা না থাকে, ওঁরা খাবার রেখে যাবেন। কিন্তু বেরোব না মানে? আমি তো কখন থেকে পা বাড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছিল, খোলা মাঠে কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে যেতে পারব দিব্যি!

ম্যাথিয়াসের গাড়ির দিকে রওনা দিলাম আমরা। হাঁটতে গিয়ে মাতালের মতো পা টলে যাচ্ছিল বারবার, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল পাগলের বিরামহীন হাসি। আসলে স্রেফ বেঁচে থাকার নেশায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

আমরা প্রথমে গেলাম ম্যাথিয়াসের হোটেলে। সেখানে গিয়ে কিছু ফোনটোন সারলাম। ফোন করলাম বাবা-মাকে। ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল আমার ভাই এড। জিজ্ঞেস করলাম, "কী করছ ওখানে বসে?"

উত্তর মজার গলার এড বলল, "কী আর করব, তুমি কোন চুলোয় গেছ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি।"

বুঝতে পারলাম, আমার খোঁজ ওরা আগেই পেয়ে গেছে। আসলে, আমি যখন এই দ্বীপে এসে উঠি তখন বেলাভূমির ভিড়ের মধ্যে ম্যাথিয়াসও ছিলেন। উনি সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর সিবি রেডিওতে খবরটা পাঠিয়ে দেন গুয়াদলুপের বন্ধু ফ্রেডির কাছে। ফ্রেডির অ্যামপ্লিফায়ার আছে, উনি বেতারবার্তাটি পুনঃসম্প্রচার করেন। ফ্লোরিডার উপকূলে মাছ ধরতে ধরতে সেই বার্তাটি পান মরিস ব্রায়ান্ড নামের এক ভদ্রলোক। তিন তখন ফোন করে আমার বাবা-মাকে খবরটা জানিয়ে দেন। অর্থাৎ আমি তীরে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে-খবর জেনে গেছেন আমার বাবা-মা।

আমার ভাই জানাল, বাবা-মা আমার জন্যে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দ্বীপে এসে হাজির হবেন।

কিন্তু ... এখন তো আর অত তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আমি ভালো আছি। যত্নে আছি। তুমি ওঁদের অত ব্যস্ত হতে নিষেধ করো।

আমার কথার উত্তরে এড জানাল, চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখবে না ও। তবে দ্বীপে যাওয়ার জন্যে বাবা-মা সম্ভবত আজ রাতেই বিমানে উঠবেন।

তখনও পর্যন্ত আমি জানি না, এতদিন ধরে ওঁরা কী ভাবে খুঁজে বেড়িয়েছেন আমাকে।

কাল আমি ম্যাথিয়াসের হোটেল ল্য সালিউ-এ চলে আসব। রাত্তিরে মঁতেরনোর বাড়িতে জোর খাওয়াদাওয়া হল। মিশেল এই দ্বীপে শুল্ক বিভাগের প্রতিনিধি। মেরি গ্যালান্টে আমার 'ভেলা পাচার' নিয়ে মজা করলাম আমরা।

www.BanglaBook.org

রাত্তিরে মঁতেরনোদের বাড়িতেই থেকে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে যেতেই চমকে উঠলাম। ভীষণ ভাবে। আরে! আয়নার মানুষটা কে?

আমার চেহারা এখন অবিকল রবিনসন ক্রুসোর মতো। মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, একমুখ দাড়িগোঁফ, গায়ের রং পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চোখদুটো কোটরের মধ্যে ঢোকানো।

মিশেল মঁতেরনো আমাকে একটা টুথব্রাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দাঁত মাজার জন্যে ওটা মুখে ঢোকাতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হল। তবে এর চাইতেও ঢের বেশি অদ্ভুত ছিল আমার দাঁতের চেহারা। অ্যাদ্দিন তো দাঁত মাজার কোনও পাট ছিল না, কিন্তু আমার দাঁতগুলো দিব্যি ঝকঝকে-তকতকে রয়েছে। এ-ব্যাপারে আমার দাঁতের ডাক্তার কী বলবেন কে জানে!

অঁদ্রের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলাম আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসার জন্যে। জিনিসপত্র বলতে নোংরা ওই ব্যাগটা। দুর্গন্ধযুক্ত টি-শার্টটা নিশ্চয়ই কেউ কাছাকাছি কোনও ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে!

একজন নার্স আমার রক্তচাপ মাপল আবার। ঠিক আছে। হাসপাতালের গেট দিয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন নিজেকে ঠিক মুক্ত মানুষের মতো মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ এক বন্দিদশা এইমাত্র শেষ হয়েছে আমার।

ম্যাথিয়াস ওঁর হোটেলে এনে তুললেন আমাকে। সেখানেই পরিচয় হল ওঁর বন্ধু মেরির সঙ্গে। মেরি বেশ সুন্দর ইংরেজি বলে। যে-ক'টা দিন ওই হোটেলে ছিলাম যত্নের কোনও ত্রুটি রাখেননি ম্যাথিয়াস। সুস্বাদু ক্রিয়োল খাদ্য মনের আনন্দে গাদা-গাদা খেতাম। আমাকে ওই পরিমাণ খাবার খেতে দেখে অবাক হত সবাই।

তেইশ তারিখ সন্ধের বিমানে বাবা-মা এলেন। বছরখানেক বাদে আবার দেখা-সাক্ষাৎ হল আমাদের। মা চোখের জলে বুক ভাসালেন। বাবা কেমন যেন একটু উদাসীন প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। আর আমি দাঁত বার করে রেখেছিলাম সর্বক্ষণ। ইতিমধ্যে কত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তবে ওঁদের কাছে এখন বোধহয় সবচেয়ে বড়ো ঘটনা: ছেলেকে ফিরে পাওয়া গেছে আবার!

এদিকে আমাকে নিয়ে প্রচণ্ড হইচই। প্রতিটি মুহূর্তেই রীতিমতো বিব্রত বোধ করেছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইংলিশ, কানাডিয়ান এবং আমেরিকান রিপোর্টারদের কাছে সুদীর্ঘ টেলিফোন-সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে। বেশ-কিছু তারবার্তা এসেছে। ফরাসি, মার্কিন উপকূল রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের কাছে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানাতে হয়েছে। আমার ছবি তোলা হয়েছে বেশ-কিছু। সি বি এস নিউজ খবর সংগ্রহের জন্যে একটি দল পাঠিয়েছে ফ্লোরিডা থেকে। 'ন্যাশানাল ইনকুয়ারার' আমাকে নিয়ে বিশেষ একটি খবর করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি আর তাতে রাজি হয়নি।

সময়-সুযোগ পেলেই আমি একটুখানি হেঁটে নিতাম। দিন-দুয়েকের মধ্যে সাহায্য ছাড়াই প্রায় একশো গজ হাঁটতে পারতাম স্বচ্ছন্দে। তবে তারপরেই আমার পা ফুলতে শুরু করল হঠাৎ। দেখতে দেখতে পা হয়ে গেল অবিকল হাতির পায়ের মতো।

www.BanglaBook.org

স্থানীয় একজন চিকিৎসক ডঃ ল্যাচেট আমাকে দেখতে আসতেন নিয়মিতভাবে। আফ্রিকার অনাহারী মানুষদের চিকিৎসা করার ব্যাপারে ডঃ ল্যাচেটের বেশ ভালোরকমের অভিজ্ঞতা ছিল। ডাক্তারবাবুর ওই অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেল এখানে।

আমার ওপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাবার পরে তিনি জানালেন— আমার সোডিয়াম লেভেল খুব বেড়ে গেছে, পটাশিয়াম লেভেল বেশ কম। এ ছাড়া রক্তশূন্যতা তো আছেই। চিকিৎসা শুরু হল নতুন করে।

খাওয়াদাওয়া আর বেড়ানো — এ ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না আমার। তবে ছোট্ট একটা সংকট দেখা দিয়েছিল। এত উত্তেজনা যে, রাতে ঘুম আসত না চট করে। ওদিকে আবার ঘুম ভেঙে যেত ভোরবেলায়। এইভাবে চললে তো শরীর সারবে না সহজে।

বাবা-মা আমাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ওঁদের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছিলেন। বলছিলেন: ওখানে গেলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে চটপট।

ওঁদের কথায় রাজি হতে পারলাম না আমি। না, ওভাবে আমার পক্ষে রুগি সেজে থাকা সম্ভব নয়। আমি বরং এখানে আর কয়েকটা দিন থাকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠব। তারপর নৌকোয় হিচ-হাইক করে অ্যান্টিগুয়ায় গিয়ে আমার চিঠিপত্র সংগ্রহ করে মেইনে যাওয়ার বিমানে চাপব।

পরের ক'টা দিন মেরি গ্যালান্টের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে দিব্যি কেটে গেল আমার। হোটেল লা সালিউয়ের বার ও রেস্তরাঁর দরজা বড়ো রাস্তায়।

দ্বীপের লোকজন প্রায়ই ওখানে চলে আসত আমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে। আমার উদ্ধারকারী সেই ধীবর-বন্ধুরাও আসত মাঝে-মধ্যে। ওরা আসলে গুয়াদলুপের বাসিন্দা। আমাকে সেদিন এই দ্বীপে নামিয়ে অনেক রাতে মাছ বিক্রি করে ঘরে ফিরেছিল। ইচ্ছে করছিল ক্লিমেন্সে চেপে ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাই, কিন্তু ইচ্ছাপূরণ হয়নি শেষ পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে আমার পা সেরে গিয়েছিল অনেকটা, হাঁটার মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল সেই সঙ্গে। দ্বীপের যে-কোনও জায়গায় গেলেই আমার চারপাশে ভিড় জমে যেত চট করে। অনেকে তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করে বসত। আমরা গল্প করতাম মনের আনন্দে।

কিছু-কিছু মানুষ আমার নাম দিয়েছিল 'সুপার ফিশারম্যান' বা 'সুপারম্যান'। এসব বললে আমি বিব্রত হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতাম বাঁচার লড়াই চালাবার মধ্যে বীরত্বের ছিটেফোঁটাও নেই। ওইসময় ওটাই ছিল আমার কাছে সহজতম কাজ। কারণ, মরার চাইতে বাঁচার চেষ্টা করা সহজ।

একদিন স্থানীয় এক 'ডাইনি-ডাক্তার' দেখতে এলেন আমাকে। ডাক্তারবাবুটি আমার মুখের কাছে ওঁর মুখ এনে কী যেন খুঁটিয়ে দেখলেন। ওঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। উনি মন্ত্রের মতো কিছু শব্দ আওড়ালেন, কীসব নাড়লেন চারদিকে: তারপর অদ্ভুতভাবে তাকালেন আবার।

www.BanglaBook.org

উনি চলে যাওয়ার পরে ম্যাথিয়াস ওঁর আসল পরিচয় আমাকে জানিয়ে দিয়ে বললেন: দেখবেন, ওঁর মন্ত্রের বলে এবার খুব দ্রুত আরোগ্যলাভ করবেন আপনি।

কিন্তু এই ঘটনার পরদিনই অসহ্য যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল আমার পেটে। সেই সঙ্গে জ্বর। জ্বর বেড়ে গেল হু-হু করে। তার ওপর আবার ডায়ারিয়া। কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, এবার আমি সত্যিই মরব। তবে ম্যাথিয়াসকে বলেছিলাম, "ওই ডাক্তারবাবুটিকে দয়া করে আমার এই 'আরোগ্যলাভের' কথা জানাবেন না!"

ক্রিয়োল রান্না সত্যিই অসাধারণ, তবে বড্ড মশলাদার। ডক্টর ল্যাচেট আর ডক্টর ডেলানয় দুজনেই বিধান দিলেন: আপনার এখন আর লঙ্কা-টঙ্কা খাওয়া চলবে না।

দিন চার-পাঁচেক খুব ভোগার পরে আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ধন্যবাদ আমার এই দুজন সুচিকিৎসককে। ধন্যবাদ আমার বাবা-মা, ম্যাথিয়াস আর মেরিকে।

সুস্থ হওয়ার পরে আবার আমি চলাফেরা শুরু করলাম আগের মতো। দেখতে-দেখতে দশটা দিন কেটে গেল এই দ্বীপে। এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বিভিন্ন নাবিকের সঙ্গে দেখা করতাম প্রায়ই। এই সময় নিক কেগ তাঁর 'থ্রি লেগ্‌স অব মান ফোর' নিয়ে হাজির হলেন এই দ্বীপে। নিক কেগ্‌কে নামে চিনতাম আমি, পরিচয় ছিল না। আলাপ করলাম। উনি আমাকে গুয়াদলুপে নিয়ে যেতে রাজি হলেন।

আমার নতুন পরিকল্পনায় সায় দিলেন আমার বাবা-মা। টাকাপয়সা দিলেন, গুছিয়েও দিলেন সঙ্গের জিনিসপত্র।

যাত্রার প্রস্তুতি শেষ হলে নির্ধারিত সময়ে জেটিতে গিয়ে হাজির হলাম আমি। মনে পড়ে গেল, এই জেটির পাশেই ক্লেন্স সেদিন ডাকি আর আমাকে এনে তুলেছিল!

রবারের ডিঙিতে চাপলাম আমি। এই ডিঙিই আমাকে নিয়ে যাবে একটু দূরে দাঁড়ানো 'থ্রি লেগ্‌স'-এ।

তীরে দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলাম ধীরে-ধীরে। মনে হল, প্রকৃত জীবনের পথে শুরু হচ্ছে আমার পুনর্যাত্রা।

নাবিকরা পাল টাঙাবার একটু পরে গুয়াদলুপের দিকে রওনা দিল থ্রি লেগ্‌স। ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে আসতে লাগল আমার প্রিয়, নতুন ওই বাসভূমিটি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG